

ড. সালমান আল আওদাহ

প্রিয় শত্রু

শ্রোমাকে ধন্যবাদ



প্রিয় শত্রু তোমাকে ধন্যবাদ

লেখক || ড. সালমান আল আওদাহ

বাংলা অনুবাদ || আশিক আরমান নিলয়

ভাষা সম্পাদনা || সাজিদ ইসলাম



সীরাত পাবলিকেশন

প্রশ্ন করা হলো, নবিজি (ﷺ) এর সাথে আবু বকর (রাঃ) এবং উমর (রাঃ) এর সম্পর্ক কেমন ছিল?

উত্তর এলো, “এ যেন একটি পাখি আর তাঁর দুটি ডানা।”

নিজেদের মধ্যকার সমস্ত মতপার্থক্য সাথে নিয়েই আল্লাহ যেন এই উম্মাহকেও পাখির দুটি ডানার মতো একত্রিত রাখেন। আমীন।

সূচি

শুরুর কথা	৯
ভূমিকা.....	১১
ধন্যবাদ, প্রিয় শত্রু.....	১৫
“বাহসে নামেন না কেন?”	১৮
ধন্যবাদ, হে আবু বকর ও উমর!	২২
ভাই ইবনু জিবরিনের চিঠি	২৫
ঈমান সবার আগে.....	৩৫
প্রতিপক্ষ সঠিক হলে সম্ভ্রষ্ট থাকুন	৪০
কটাক্ষ করা: একটি আধুনিক কালচার	৪৫
কথা সত্য, মতলব খারাপ.....	৫২
দ্বীনের ঢালে স্বার্থ হাসিল	৫৫
চলতি চিন্তাধারা.....	৫৮
যাহা বলিব, ন্যায় বলিব	৬১
সমালোচনা ও সৌজন্য	৬৭
সমালোচনা ও আত্মজিজ্ঞাসা	৭২
সমালোচনা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ	৭৬
নিরপেক্ষতা	৮২
এ পথ, ও পথ	৮৫
অস্থির মানসিকতা.....	৮৯
অন্তরের শান্তি	৯১

সহাবস্থান করতে শেখা	৯৭
সহাবস্থানই শক্তি	১০২
সত্যিকারের অংশগ্রহণ	১০৭
সকল নবির সূন্যাহ	১১০
ব্যক্তিগত দায়িত্ব	১১৬
মনে হবে কি না হবে আমারে?	১২০
শান্তসৌম্য	১২৩
নৈতিক চরিত্রের পরীক্ষা	১২৬
রাগের সময় আত্মসংবরণ	১৩০
আমি তো ছিলাম ভালো	১৩৭
চলুন, সম্প্রীতি গড়ি	১৪১
লেখক পরিচিতি	১৪৪

শুরুর কথা

দুঃখজনকভাবে আমাদের মধ্যে একটি সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে যেখানে মতপার্থক্যের সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে শত্রুতা। যে কেউ অন্য কারো সাথে দ্বিমত করলে, কারো মতকে সমর্থন না করলেই যেন সে তার শত্রু হয়ে গেল। এখন এই শত্রুকে দমনের জন্য সমস্ত শ্রম, সময় খরচ করতে হবে। যেন এই শত্রুর চেয়ে ক্ষতিকর আর কিছু নেই। অথচ মতপার্থক্য ইসলামের একটি সৌন্দর্য। নববি যুগ থেকেই ভিন্ন মত পোষণের এই সুস্থ সংস্কৃতি আমাদের যুগে এসে এক অসুস্থ ধারায় রূপ নিয়েছে।

দ্বীনের মাসআলা মাসায়েল থেকে শুরু করে লেনদেন, দাম্পত্য, পারিবারিক-সামাজিক সম্পর্ক, রাজনীতি সব জায়গায় ভিন্ন মতের প্রতি অসহিষ্ণুতা, একে অপরের সাথে শিষ্টাচার বহির্ভূত আচরণ, নোংরা অপবাদ, অপমানের এই দম বন্ধ হয়ে আসা সংস্কৃতির মাঝে সেই নববি আদর্শের পুনর্জাগরণ এখন সময়ের দাবি।

কখনও ব্যক্তিগত আক্রোশ মেটাতে, কখনও কারো জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে, কখনও অজ্ঞতায়, কখনও দলাদলিতায় আমরা নিজেদের মধ্যেই চারপাশে অনেক শত্রু তৈরি করে নিয়েছি। নিজেদের ব্যক্তিগত এই ক্ষোভকে আমরা “দ্বীনের স্বার্থ রক্ষা”, “সত্য উন্মোচন করা”, “উম্মাহর বৃহত্তর স্বার্থে” নানান মোড়কে আড়ালও করে রাখি। দ্বীনকে ঢাল বানিয়ে নিজেদের মধ্যকার শত্রুতা জিইয়ে রাখি বছরের পর বছর। অতি তুচ্ছ বিষয়কে কেন্দ্র করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অহেতুক তর্ক, আক্রমণ পাল্টা আক্রমণ, একে অপরকে খণ্ডনে আমরা ব্যস্ত হয়ে পড়ি। অথচ দিনশেষে এর কোনোটিরই কোনো ফায়দা নেই—না নিজের, না উম্মাহর।

স্বয়ং আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এর সময়ে উম্মাহর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজন্ম সাহাবাদের মধ্যে মতপার্থক্য হতো, তাঁরা একে অন্যের মতের বিরোধিতাও করতেন, অথচ এরপরও দ্বীনের স্বার্থ প্রসঙ্গে তাঁরা কখনও ভাগ হয়ে যেতেন না, একসাথে সীসাঢালা প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে যেতেন। রাসূল (ﷺ) এর সবচেয়ে কাছের দুই সাথী আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ও উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলতে গেলে

প্রায় অধিকাংশ বিষয়ে একে অপরের সাথে দ্বিমত করতেন। অথচ এই দুইজনের সাথে রাসূল (ﷺ) এর সম্পর্ক কেমন ছিল এমন প্রশ্নের জবাবে একজন আলিম বলেছিলেন, এ যেন একটি পাখি আর তাঁর দুটি ডানা।

আলোচ্য বইটি মূলত শাইখ সালমান আল আওদাহর কিছু প্রবন্ধ সংকলন যেখানে তিনি সমালোচনা, সমালোচনাকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া পারস্পরিক শত্রুতা, সমালোচক ও সমালোচনার শিকার হওয়া ব্যক্তিদের সমস্যা, এ থেকে উত্তরণের উপায়, এসব মতপার্থক্যকে মেনে নিয়েও কীভাবে একটি উম্মাহ হিসেবে আমরা এক থাকতে পারি তার কিছু মূলনীতি এবং এই আক্রমণ পাল্টা আক্রমণের মাঝেও নিজেদের মধ্যে ইসলামের নৈতিক শিক্ষার চর্চার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আরবিতে উনার বিভিন্ন প্রবন্ধের সংকলন **شكر الأعداء** নামে সংকলিত হয়েছে। সেখান থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রবন্ধ নিয়ে তৈরি হয়েছে একটি ইংরেজি সংকলন 'My Enemies I Thank You'. আমাদের এই 'প্রিয় শত্রু, তোমাকে ধন্যবাদ' সেই সংকলনেরই সরল বাংলা অনুবাদ। অনুবাদ সাবলীল রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে, সেই সাথে বইতে কুরআনের আয়াত এবং হাদিসের আরবি টেক্সট যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।

অশান্ত এই ফিতনার সময়ে আমরা আশাবাদী এই বইটি আমাদেরকে নতুন কিছু শেখাবে। বাড়াবাড়ি আর ছাড়াছাড়ির মাঝামাঝি নববি আদর্শের কিছু পাঠ আমরা এখান থেকে পাব যা আমাদের চলার পথের পাথেয় হতে পারে ইনশাআল্লাহ।

বইয়ের অনুবাদক এবং বইয়ের বিষয়ে যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন সবাইকে আল্লাহ উত্তম প্রতিদান দান করুন। আল্লাহ সকলের মেহনতকে কবুল করুন। আমীন।

সীরাত পাবলিকেশনের পক্ষে

সাজিদ ইসলাম

২১ আগস্ট, ২০১৯

ভূমিকা

আমার কিছু প্রিয় ভাই আছেন, তারা অবশ্য আমাকে অতটা প্রিয় মনে করেন না। কিছু ব্যাপারে আমার সাথে দ্বিমত হওয়ায় তারা আমাকে রীতিমত গালমন্দ করেছেন। কিন্তু এমন পরিস্থিতিতে নিজের রাগ গিলে ফেলে নিজেকে শান্ত রাখতে পারার সেই স্মৃতি মনে পড়লে ভালোই লাগে। যত যা-ই হোক, আমাদের মাঝে মতপার্থক্যের চেয়ে ঐক্যমত্যের সংখ্যাই বরং অনেক বেশি।

ভাবতে ভালোই লাগে যে, আল্লাহ নিজেকে সংবরণ করতে আমাকে সাহায্য করেছেন। মাথা গরম করে অনর্থক ও তুচ্ছ বিতর্কে লিপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন। না হলে আমি হয়তো সচেতন বা অবচেতনভাবে নিজের নফসকে বিজয়ী করার নিয়তে তর্ক শুরু করতাম—সত্যকে বিজয়ী করার জন্য না।

এরকম পরিস্থিতিতে স্বার্থ ও কুতর্ককে জায়েজ করার জন্য অনেকরকম চটকদার সাইনবোর্ড লাগাতে ইচ্ছে হয়। “সত্য প্রকাশ করা”, “সঠিক বিষয় উন্মোচন” আরো কত কী! নিজেকে এই ঝোঁকের কাছে সাঁপে দেওয়া মানে দুর্গম ও প্রাণহীন এক মরুভূমিতে আছড়ে পড়া।

ধর্মীয় চেতনা অন্তরে লালন করে আমাদের উচিত ছিল আদর্শ ও সদাচারী মানুষ হওয়া—যাদের পারস্পরিক লেনদেন হবে ইতিবাচক। দুর্ভাগ্যবশত অনেকে এর ফলে উল্টো সংকীর্ণমনা, খিটমিটে ও বিদ্বেষী হয়ে ওঠে। কখনও তাদের জজবা তাদের উদ্বুদ্ধ করে সারাক্ষণ অন্যের দোষ খুঁজে বেড়াতে। এই ধরনের মানুষদের সকলে এড়িয়ে চলতে পারলেই বাঁচে। কারণ, এদের কাছে গেলেই নানা প্রশ্নবাণে জর্জরিত হয়ে নিজের ধার্মিকতার ইন্টারভিউ দেওয়া লাগবে: “আপনি কোন মতাদর্শে বিশ্বাসী? কোন কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করেন? আপনার শাইখ কে? অমুক অমুক বিষয়ে আপনার অবস্থান কী?”

আমার মনে আছে, একবার এক যুবক এসে আমার শিক্ষক সালিহ আল-বুলায়হির সাথে একাকী কথা বলতে চাইল। তিনি উঠে যুবকের সাথে একটু দূরে গিয়ে কথা

বলতে লাগলেন। দুজন একসাথে হওয়ামাত্রই যুবকটি আক্রোশে ফেটে পড়ে বলল, “আমি আপনাকে আল্লাহর জন্য ঘৃণা করি!”

আমার শিক্ষক মুচকি হাসি দিয়ে বললেন, “আচ্ছা, আচ্ছা। সেটা কেন?”

যুবক বলল, “কারণ আপনি বলেন যে, চাল দিয়ে ফিতরা দেওয়া আর বিশ রাকা’আত তারাবীহ পড়া জায়েজ।”

এর উত্তরে আমার শিক্ষক বললেন, “আমাদের নবিজি (ﷺ) উপদেশ দিয়েছেন যে, কাউকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসলে তাকে তা জানিয়ে দিতে। সুনান আবু দাউদ গ্রন্থে হাদিসটি এসেছে। কিন্তু কাউকে আল্লাহর জন্য ঘৃণা করলে জানিয়ে দিতে হবে, এ মর্মে কোনো হাদিস আছে বলে তো মনে পড়ছে না!”

তিনি ছোটখাটো বিষয়ে তর্কে লিপ্ত হওয়া থেকে সুন্দরভাবে সরে আসলেন। এসব তর্ক-বিতর্কে তাদের উভয়ের অন্তর কঠিন হয়ে যাওয়া ছাড়া কোনো লাভই হতো না।

তর্ক পরিহার করতে পারা একটি অসাধারণ গুণ। এর একটি ফজিলত হলো এতে সময় বাঁচে। এছাড়াও এতে আমাদের অন্তর নিষ্কলুষ থাকে আর অন্যদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় থাকে।

আমি আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ যে, অন্যেরা আমার সাথে দ্বিমত করতে গিয়ে অসদাচরণ করলেও আমার অন্তর পরিষ্কার রাখতে কষ্ট হয় না। এমনটা করার একটি উপায় হলো তাদের আচরণ ভুলে যাওয়া। নিজেকে বলুন, “কিছু মানুষ অন্যদের সাথে কথা বলার পদ্ধতি শেখেইনি।”

একসময় আমি আরো ভালো একটি উপায় শিখলাম—তাদের জন্য দু’আ করা। দু’আ কবুলের সময়গুলোতে তাদের জন্য মাগফিরাত ও রহমতের দু’আ করুন। দু’আ করুন তারা যেন এই দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারে। দেখবেন হৃদয়ের ভার কমে গেছে।

জ্ঞানী-মূর্খ, পুণ্যবান-পাপী নির্বিশেষে সকল মুসলিমের জন্য দু’আ করা অত্যন্ত ভালো আমল। সত্যি বলতে আমি পুরো মানবজাতিকেই আমার দু’আয় অন্তর্ভুক্ত করি। দু’আ করি যেন আল্লাহ তাদের সবচেয়ে কল্যাণময় পরিণতি দেন, জালিমদের হাত থেকে তাদের রক্ষা করেন, তাদের উপর নিজের অনুগ্রহ বর্ষণ করেন, এবং রহমত-মাগফিরাত-হিদায়াত দান করেন।

এমনটা হতেই পারে যে, অন্যের অসদাচরণ পেয়ে আমিও হঠাৎ করে সব সদাচরণের শিক্ষা ভুলে গেলাম। নীতি-আদর্শের কথা মনে ওঠার আগেই প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে পাল্টা জবাব দিতে লাগলাম। এই অভিজ্ঞতাগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের বিনয় শিক্ষা দেন। স্মরণ করিয়ে দেন যে, জীবনের এই পাঠশালায় আমরা এখনও আনাড়ি শিক্ষার্থী। আমরা সুযোগ পাই আল্লাহর কাছে এই বলে প্রত্যাবর্তন করার,

﴿٢٢﴾ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

“আপনি পবিত্র, মহান! আপনি আমাদের যা শিক্ষা দিয়েছেন, তা ছাড়া আমাদের আর কোনোই জ্ঞান নেই। নিশ্চয়ই আপনিই সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।” (সূরাহ আল-বাকারাহ ২:৩২)

﴿٢٣﴾ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

“হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের উপর জুলুম করেছি। আপনি যদি আমাদের ক্ষমা না করেন ও আমাদের প্রতি দয়া না করেন, তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।” (সূরাহ আল-আ'রাফ ৭:২৩)

হোঁচট খেলেই বরং আরো সচেতন হতে হয়। নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারালে ভবিষ্যতে আরো সাবধান থাকতে হবে নিজের ভাবগান্ধী রক্ষায়। আয়ত্ত করতে হবে ধৈর্যধারণ করা, ক্ষমা প্রদর্শন ও উপেক্ষা করার শিল্প।

আল্লাহর কাছে তাওবাহ করতে হবে। দু'আ করতে হবে তিনি যেন আমাদের অন্তর পরিশুদ্ধ করে দেন, আমাদের ভেতরকে বাহিরের চেয়েও সুন্দর করে দেন। জ্ঞান, বিশ্বাস ও সৎকর্মে যারা আমাদের চেয়ে অগ্রবর্তী, তাঁদের সাথে কথা বলার সময় বিনয়ী হতে যেন আল্লাহ আমাদের সাহায্য করেন। কখনোই যেন কারো প্রতি উদ্ধত-অহংকারী আচরণ না করি, তার যতই ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকুক না কেন।

নবিজি (ﷺ) বলেছেন,

كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ

“আদম (আলাইহিসসালাম) এর সকল সন্তানই গুনাহগার। উত্তম গুনাহগার সে, যে তাওবাহ করে।” [১]

[১] সুনান তিরমিযি: ২৪৯৯, ইবনু মাজাহ: ৪২৫১

যাদের আমরা বাহ্যিকভাবে ভুল করতে দেখি, তাদের হয়তো এমন অনেক গুণ আছে যার কথা কেবল আল্লাহই জানেন। আলিম, দাঈ বা ধর্মীয় নেতা হবার স্বপ্নে বিভোর অনেক মানুষের চেয়ে তারা হয়তো এসব গুণাবলিতে যোজন যোজন অগ্রসর। আল্লাহ আমাদের জানাচ্ছেন নূহ আলাইহিসসলাম-এর উক্তি,

وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا ۚ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ ۚ
إِنِّي إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٣١﴾

“...তোমাদের চোখে যারা হীন, তাদের ব্যাপারে আমি বলছি না যে, আল্লাহ তাদের কখনও কোনো কল্যাণ দান করবেন না। বরং তাদের অন্তরে যা আছে, সে সম্পর্কে আল্লাহই ভালো জানেন। (যদি এমনটা বলি,) তাহলে নিশ্চয়ই আমি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।” (সূরাহ হূদ ১১:৩১)

এই বইয়ের অধ্যায়গুলো আসলে কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন সময়ে লেখা আমার কিছু প্রবন্ধ। তবে এগুলো পরস্পর নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। প্রতিটিরই আলোচ্য বিষয় হলো মতানৈক্য ও দ্বন্দ্ব এবং এসব ক্ষেত্রে আমাদের করণীয়। এ সংক্রান্ত আলোচনার যেসব দিক আমার বিগত প্রবন্ধগুলোতে ছুটে গিয়েছিল, সেগুলোর উপর আমি নতুন করে লিখেছি।

ই-মেইল, ফেইসবুক, ও অন্যান্য মাধ্যমে আমি এই বইটির পাঠকদের প্রতিক্রিয়া জানতে আগ্রহী। বইয়ের শুরুর দিকের পৃষ্ঠাগুলোতে যোগাযোগের ঠিকানা পাবেন। আপনাদের পরামর্শ, সমালোচনা, সংশোধনকে আমি স্বাগত জানাই। এর দ্বারা আমার জ্ঞান সমৃদ্ধ হবে ও বইটির পরবর্তী সংস্করণগুলো পরিমার্জিত হবে। বইটি পড়ার জন্য যারাই নিজ নিজ মূল্যবান সময় থেকে কিছু সময় ব্যয় করেছেন, তাদের সকলের প্রতি আমি ধন্যবাদ জানাই। বিশেষ করে তাদের প্রতি, যারা আমাকে তাদের মন্তব্য লিখে পাঠাতে আরেকটু কষ্ট করবেন।

-ড. সালমান আল আওদাহ

ধন্যবাদ, প্রিয় শত্রু

মানুষের আচরণের সবচেয়ে ঘৃণ্য দিক হলো শত্রুতা জিইয়ে রাখা। দুর্ভাগ্যবশত, মানুষে-মানুষে ঝগড়া লাগানোর রেসিপি খুবই সহজ। শুধু দরকার একটু বোকামি আর অপরিণত সিদ্ধান্ত, সেইসাথে মানবমনের অনুভূতিকে একদমই তোয়াক্কা না করা। এই উপাদানগুলো সঠিক পরিমাণে মেশালেই আপনি পেয়ে যাবেন পরস্পরের সাথে ঝগড়া আর গালিগালাজে লিপ্ত কিছু ঘৃণাজীবী মানুষ।

নিজের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি যে, তর্ক করতে তেড়ে আসা লোকদের সাথে ধৈর্যধারণ ও সৌজন্য প্রদর্শনের অনেক সুফল রয়েছে। এদের উপর কুরআনে বর্ণিত ঔষধ প্রয়োগ করতে হয়—উত্তম কথা দিয়ে জবাব দেওয়া।

ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴿٣٤﴾

“মন্দকে প্রতিহত করো উত্তমের মাধ্যমে। তাহলে দেখবে তোমার সাথে যার শত্রুতা রয়েছে, সে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যাবো।” (সূরাহ ফুসসিলাত ৪১:৩৪)

কেউ আমাকে ঘৃণা করে বলে আমি তার প্রতি রাগ পুষে রাখতে পারি না। এই মানুষগুলো তো আমার জীবনেরই অংশ। দুনিয়ার জীবনে কোনো সাফল্য পেতে ও কাজের কাজ কিছু করতে হলে এই মানুষগুলোকে সহ্য করার সামর্থ্য থাকা চাই। এটিই প্রজ্ঞাময় আল্লাহর বিধান।

আমি বরং বলি, ধন্যবাদ, হে আমার শত্রুগণ!

আপনারাই আমাকে শিখিয়েছেন বিব্রত না হয়েই কীভাবে সমালোচনা শুনতে হয়, তা যতই আঘাত দিক না কেন। চরমতম অপমান আর নিরুৎসাহমূলক কথা শোনার পরও কী করে নির্দিধায় এগিয়ে যেতে হয়, তাও আপনারাই শিখিয়েছেন।

জীবনের এই অতি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাটি কোনো বই পড়ে শেখা সম্ভব নয়। আল্লাহ আমাকে যেসব অভিজ্ঞতার মুখোমুখি করান, সেগুলো সহ্য করার মাধ্যমেই তা শেখা যায়। প্রথমে অনেক ব্যথা-বেদনা হয়, কিন্তু তা মেনে নেয়া লাগে।

ধন্যবাদ, হে আমার শত্রুগণ!

আপনারা আমাকে আত্মনির্ভরশীল করেছেন। চাটুকারিতা থেকে বাঁচিয়েছেন। প্রশংসা আর সমালোচনার এক ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি আমার সামনে তুলে ধরেছেন। আপনাদের কারণেই আমি চাটুকারদের শিকার হওয়া থেকে বেঁচে গিয়েছি। যারা আমার প্রাপ্যের চেয়ে বেশি প্রশংসা করে আর আমার কোনো দোষই দেখতে পায় না—তাদের হাতে আমাকে পড়তে হয়নি। এই ধরনের মানুষেরা আপনাদের বিপরীত। কারণ, আপনারা আমার মধ্যে শুধু দোষই দেখেন আর আমার ভালো কাজকেও খারাপ মনে করেন।

ধন্যবাদ, হে আমার শত্রুগণ!

আপনারা অনেক মানুষকে উদ্ধার করেছেন সত্যের পক্ষে মুখ খুলতে। আপনাদের বিষোদগার দেখেই তারা সত্যকে জানতে তৎপর হয়েছে এবং সত্যটা জানার পর তার প্রতিরক্ষায় নেমেছে।

ধন্যবাদ, হে আমার শত্রুগণ!

আপনাদের কাছে ভালো লাগুক বা না লাগুক, আপনারা আমাকে আরো শক্তিশালী, ভারসাম্যপূর্ণ ও চিন্তাশীল মতামত তৈরিতে সাহায্য করেছেন। কেউ কেউ কঠিন উপসংহারে পৌঁছে গিয়ে বাড়াবাড়ি করে ফেলে। আপনাদের কারণেই আমি নিজের মতামত পুনর্বিবেচনা করে তা সংশোধন ও উন্নয়নে সচেষ্ট হই।

শত্রু ভাইয়েরা আমার, আমি আপনাদের সাথে তর্ক করা পরিহার করেছি দেখে রাগ করবেন না। মানুষ নিজের মতের পক্ষে তর্ক করতে খুব বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়লে তা আর পুনর্বিবেচনার সময় পায় না। সে তখন উত্তেজিত হয়ে প্রতিপক্ষের দাঁতভাঙা জবাব দেওয়ার পেছনে সব চেষ্টা ঢেলে দেয়। কোনো গঠনমূলক চিন্তা করতে পারার মানসিক শক্তি হারিয়ে ফেলে। সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার কী জানেন? সে প্রতিপক্ষের মতটি ঠাণ্ডা মাথায় বোঝার চেষ্টা করে না। অথচ সেটাও সঠিক হবার সম্ভাবনা ছিল।

হাতিম আল-আসসাম (রহিমাছল্লাহ) একবার বলেছেন, “তিনটি গুণ আমাকে বিতর্কের সময় সাহায্য করে।

১) আমার প্রতিপক্ষ সঠিক প্রমাণিত হলে আমার কাছে ভালো লাগে।

২) সে যখন ভুল প্রমাণিত হয়, তখন তার জন্য আমার দুঃখ লাগে।

৩) আর আমি সবসময়ই আমার জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণে রাখি, যাতে তাকে অপমান করে না বসি।”[২]

ধন্যবাদ, হে আমার শত্রুগণ!

আপনারাই আমার প্রত্যয় দৃঢ় করেছেন, আমাকে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি করেছেন, আমাকে বেড়ে ওঠার সুযোগ দিয়েছেন, আর আমার দক্ষতার পরিচর্যা করেছেন। আমি নিজের প্রতি কঠোরতর হতে শিখেছি, আচরণ সংযত করতে শিখেছি, আত্মোন্নয়নে আগ্রহী হয়েছি। আল্লাহ আমাদের যেই গন্তব্যের দিকে ডাকেন, সেই জান্নাতে যাবার জন্য প্রতিযোগিতা করতে শিখেছি।

وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ

“অতএব, প্রতিযোগীরা এর জন্য প্রতিযোগিতা করুক।” (সূরাহ আল-মুতাফিফীন ৮৩:২৬)

এই প্রতিযোগিতার মহত্ত্ব নির্ভর করে অংশগ্রহণের পদ্ধতি, অগ্রযাত্রার সৌন্দর্য আর লক্ষ্যের বিশুদ্ধতার উপর।

ধন্যবাদ, হে আমার শত্রুগণ!

আপনারা আমাকে ধৈর্য ও ক্ষমাশীলতা শিখিয়েছেন। কঠোর আচরণের জবাবে দয়া দেখাতে শিখিয়েছেন। এসব গুণ শুধু নেক আমলের বিনিময়ে অর্জন করা যায় না। বরং ধৈর্য, আত্মসংযম, সহনশীলতা, মহানুভবতা ও ক্ষমাপ্রদর্শনের মাধ্যমে অর্জন করতে হয়।

শত্রু ভাইয়েরা, বুঝতে পারছি আমার এই কথাগুলো আপনাদের রাগ আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে। কিন্তু সেটা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি মন থেকেই বলছি, আপনারাই আমার সত্যিকারের বন্ধু। মতপার্থক্য সত্ত্বেও আপনারাও আমার মতোই মানুষ, তার উপর আমার মুসলিম ভাই। যেসব বিষয়ে আমরা একমত, সেগুলোর তুলনায় মতপার্থক্যপূর্ণ বিষয়ের সংখ্যা নগণ্য।

আমি আপনাদের প্রতি বিদ্বেষবশত শত্রু বলে সম্বোধন করছি না। বরং আপনারা আমার শত্রু পরিচয়ে পরিচিত হতে চান বলেই এই সম্বোধন করছি। আমি তো আপনাদের বন্ধুই মনে করি, তা আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্টই হোন বা অসন্তুষ্ট।

হে আমার শত্রুগণ, আপনাদের জানাই ধন্যবাদ এবং সালাম।

[২] আবু নুয়াইম, আল-হুলইয়াহ: ৮/৮২, তারিখে বাগদাদ: ৮/২৪২

“বাহাসে নামেন না কেন?”

অনেকেই আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন যে, আমি বিরোধীদের জবাব দিই না কেন। তারা যেখানে ভুল করছেন, সেগুলো প্রমাণসহ তুলে ধরে খণ্ডন কেন করছি না?

আমি কি তাদের অবজ্ঞা করছি? তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করছি?

মোটাই না! কিছু ক্ষেত্রে নিজের মতের পক্ষে বাহাসে না নামাটাই উত্তম সিদ্ধান্ত। এর বেশ কিছু কারণ রয়েছে:

১। কয়েকটি কাজে একসাথে ব্যস্ত থাকলে বারবার কাজ থামিয়ে মানুষের কথা শোনা কষ্টকর। প্রথমত, তাদের সব আপত্তিগুলো ভালোভাবে জানতে হয়। এরপর প্রত্যেকটি ধরে ধরে উত্তর দিতে হয়। যদি অন্যান্য কাজ ও প্রকল্পে ব্যস্ত থাকেন, তাহলে মানুষের সাথে বিতর্ক করার চেয়ে অনেক দরকারি কাজ আপনার হাতে আছে।

২। মতবিরোধকারীদের জবাব দেওয়ার ক্ষেত্রে কখনোই তাড়াহুড়া করা উচিত নয়। তাড়াহুড়া করতে গেলে আপনি অতিআবেগী হয়ে নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে চাইবেন। অথচ বিষয়টি তার গুরুত্ব অনুপাতে সময় ও মনোযোগ পাওয়ার দাবি রাখে।

এছাড়াও সমস্যাটিকে দূর থেকে ভালোভাবে দেখার জন্য আপনাকে সময় নিতে হবে। তাহলে আপনি মানুষের আপত্তিগুলোকে নিরপেক্ষভাবে দেখতে পারবেন। মানুষের কথার প্রতি যেনতেনভাবে একটা প্রতিক্রিয়া দেখালেই তো হলো না। এভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাতে গিয়ে মুখ ফসকে আপনিও হয়তো অসত্য কিছু বলে বসবেন।

সমালোচকদের তাড়াহুড়া করে জবাব দিতে গেলে আপনি তাদের বক্তব্যের মধ্যকার সত্যটি দেখতে পাবেন না। তাদের কথাই যে সঠিক, তা না। কিন্তু তাদের মূল বক্তব্য যদি ভুলও হয়, সেখানেও তো কিছু যৌক্তিক সমালোচনা থাকতে পারে যা আপনি আগে খেয়াল করেননি। বিশেষত প্রতিপক্ষ কঠোর ভাষা ব্যবহার ও

ব্যক্তিগত আক্রমণ করলে সেই যৌক্তিক অংশগুলো আলাদা করতে পারা আরো কঠিন হয়ে যায়।

যেহেতু “জ্ঞানই মুমিনের গন্তব্য”, সেহেতু সত্য থেকে আপনি উপকৃতই হবেন। সেই সত্য যার কাছ থেকেই আসুক, যেখান থেকেই আসুক। নবি সুলাইমান আলাইহিসসালামকে সামান্য এক হৃদহৃদ পাখি বলেছিল,

أَخْطُتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَحِثُّكَ مِنْ سَبِّا بِنَبِيٍّ يَقِينٍ ﴿٢٢﴾

“আমি এমন বিষয় জেনেছি, যা আপনি জানেন না। আর আমি আপনার কাছে এসেছি সাবা থেকে সুনিশ্চিত সংবাদ নিয়ে।” (সূরাহ আন-নামল ২৭:২২)

৩। সব ব্যাপারেই ইজমা প্রতিষ্ঠিত হতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। সবার সবকিছুতে একমত হওয়া জরুরি নয়। আলাহ তাআলা কুরআনে বলেন,

وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴿١١٨﴾ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ

“তারা মতপার্থক্য করা থামাবে না; তারা ব্যতিক্রম, যাদের উপর আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহ বর্ষিত করেছেন।” (সূরাহ হূদ ১১:১১৮-১১৯)

আমাদের এই পার্থিব জীবনের অপরিহার্য অংশ হলো মতপার্থক্য। এমনকি দুজন নবি দাউদ আলাইহিসসালাম ও সুলাইমান আলাইহিসসালাম নিজেদের মাঝে মতভেদ করেছেন। রাসূল (ﷺ) এর নিকটতম দুই সাহাবি আবু বকর রাডিয়াল্লাহু আনহু ও উমর রাডিয়াল্লাহু আনহু মাঝেও মতভেদ হয়েছে। হয়েছে ইসলামের প্রখ্যাত আলিমগণের মাঝেও।

কোনো ব্যাপার চিরতরে অমীমাংসিত থেকে যাওয়া দোষের কিছু নয়। আপনার অধিকার আছে একটি মত পোষণের, আরেকজনের অধিকার আছে আরেকটি মত পোষণের। প্রতিটি মতভেদ নিয়েই সুদীর্ঘ বাহাস আয়োজন করার কি কোনো দরকার আছে, যেখানে এক পক্ষকে শেষমেশ ভুল স্বীকার করতেই হবে? এ তো কেবল সময়ের অপচয়!

সাধারণত যা হয়, কিছু ব্যাপারে আপনার বক্তব্য ঠিক আর কিছু ব্যাপারে আপনার প্রতিপক্ষের বক্তব্য ঠিক। মানুষ একটা বিষয়কে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে। সময় নিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় বিবেচনা করলে একসময় সম্পূর্ণ চিত্রটি নজরে আসে।

৪। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এমনটা ঘটে যে, আপনি আপনার সমালোচকের কথার জবাব দিলেন, এরপর সমালোচক আবার আপনার বক্তব্যের খণ্ডন নিয়ে হাজির হয়। হতে পারে আপনার সমালোচকের হাতে এই বিষয়ের জন্য আপনার চেয়ে বেশি সময় আছে। এখন আপনি কি আপনার মূল্যবান সময় ও শ্রম ব্যয় করে বিতর্ক চালিয়ে যাবেন, না মাঝপথে এমনভাবে থেমে যাবেন যে—দেখে মনে হয় আপনি হার মেনে নিয়েছেন? প্রথমবারেই এই জবাব-পাল্টা জবাব পরিহার করলে আর এই ঝামেলায় পড়া লাগত না।

৫। এ ব্যাপারে আমরা সবাই একমত যে, নিজের ভুল বুঝতে পারার পর প্রথম সুযোগেই তা স্বীকার করে নিয়ে সত্যের ঘোষণা দেওয়া উচিত। ভুল স্বীকার করলে সুবিবেচক লোকদের কাছে আপনার মর্যাদা বাড়বে বৈ কমবে না। তারা আপনাকে এর জন্য আরো বেশি সম্মান করবেন।

এ কারণেই আমার সমালোচক ও নিন্দুকদের ততটাই সম্মান করি, যতটা করি আমার সমমনাদের। এমনকি যারা কর্কশ ভাষায় সমালোচনা করে, তাদের ব্যাপারেও আমার অবস্থান এটাই। আমি বুঝতে পারছি যে, তারা সত্যের সন্ধানেই এত তৎপর হয়েছেন। আর তাদের সমালোচনার ফলে আমার জ্ঞানও সমৃদ্ধ হয়। তাদের আচরণ যদি ভালো না-ও হয়, তারা আমার কৃতজ্ঞতা লাভের দাবিদার। তাদের মুখ আর কলমের ধার যত বেশিই হোক, শেষমেশ তাদের পর্যবেক্ষণ থেকে আমিই লাভবান হই। কাজেই আমার সত্যিই উপকৃত হওয়ার ইচ্ছে থাকলে কর্কশভাষী সমালোচকদের প্রতিও আমায় ধৈর্যশীল হতে হবে।

কিছু বিষয়ে অনেকগুলো মত থাকে, যেগুলোর প্রতিটির স্বপক্ষেই প্রমাণ ও যুক্তি আছে। ইসলামি শরিয়তের অনেক বিষয়ই এরকম। এগুলো আলোচনা করার মতো মানুষ যতদিন থাকবে, ততদিন এ নিয়ে মতভেদ থাকবে। এগুলো আসলে সুস্থ ধারার মতপার্থক্য এবং মানুষের তো মতভেদ করার অধিকার থাকা উচিত। কিন্তু এই মতভেদগুলোকে যেন তারা নিজেদের মধ্যে মনোমালিন্য ও প্রতিহিংসা তৈরির মাধ্যম না হতে দেন।

আমাদের উচিত নবিজি (ﷺ)-এর এই দু'আ নিয়ে চিন্তাভাবনা করা।

اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اهْدِنِي لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ
مِنَ الْحَقِّ يَا ذِئْبِكَ إِنَّكَ تُهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

“হে জিবরাইলের রব, মিকাইলের রব, ইসরাফিলের রব! হে আসমান ও জমিনের স্রষ্টা! হে দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী! আপনার বান্দারা যা নিয়ে মতভেদ করে, আপনি তাদের মধ্যে সে ব্যাপারে ফায়সালা করে দেবেন। সত্য ও ন্যায়ের যেসব বিষয়ে মতানৈক্য পোষণ করা হয়েছে সে বিষয়ে আপনি আমাকে পথ দেখান। আপনি যাকে ইচ্ছে করেন, তাকেই সরল পথে দেখান।” [৩]

[৩] সহিহ মুসলিম: ৭৭০

ধন্যবাদ, হে আবু বকর ও উমর!

মানুষ যতটা সৎ ও নিরপেক্ষ থাকবে, কর্কশ ও অবিবেচনাপ্রসূত কথা বলা থেকে বিরত থাকবে—অন্যের আক্রমণের শিকার হওয়া থেকে সে ততটা নিরাপদ থাকবে বলেই আপাতদৃষ্টে মনে হয়। কারণ তখন তো তার সাথে মতভেদ হওয়ার সম্ভাবনাই অনেকখানি কমে আসে।

আমার মনে হয় একটি সীমিত পরিসরে এ কথাটা খুবই প্রযোজ্য। আমাদের সালাফদের কেউ কেউ বলেছেন, “যার অন্তর পরিশুদ্ধ, সে তত উদারভাবে কথা বলতে জানে।”

রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

“মানুষের সাথে একজন মুমিন মানিয়ে চলে। এমন মানুষের মাঝে কোনো কল্যাণ নেই, যে নিজেও মানুষের সাথে মানিয়ে চলার চেষ্টা করে না আর অন্যদেরও তার সাথে মানিয়ে চলতে দেয় না।”^[৪]

কিন্তু তারপরও এটাও সত্যি যে, একজন মানুষ বিখ্যাত বা সফল হয়ে গেলে অবশ্যই আগের চেয়ে বেশি শত্রুতার সম্মুখীন হবে। কারণ তখন তার ব্যাপারে মাথা ঘামানো লোকের সংখ্যা বেড়ে যাবে। কেউ তার সমমনা, কেউ বিপরীত মতাদর্শী। কেউ থাকবে সন্দেহপোষণকারী আর অভিযোগকারী। খ্যাতি যত বাড়বে, পরিচিতির এই বৃত্তের পরিধিও ততই বাড়বে। নবি-রাসূল আলাইহিসসালাম সহ বৈশ্বিক নেতৃবৃন্দ বা ঐতিহাসিক ব্যক্তিবর্গের ক্ষেত্রে এই বৃত্তের ভেতর গোটা পৃথিবীই চলে আসতে পারে।

ইসলামের সবচেয়ে বিখ্যাত ব্যক্তিদের মধ্যে দুজনের কথাই ধরুন। আবু বকর এবং উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা। তাঁদের চেয়ে বেশি ইখলাস ও দৃঢ় ঈমানের দৃষ্টান্ত খুঁজেই পাবেন না। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে বলা হয়েছে, “আবু

[৪] মুসনাদ আহমাদ: ৯১৯৮, মুস্তাদরাক আল-হাকিম: ১/২৩

বকর সাওম বা সালাতের সংখ্যা দিয়ে তোমাদের চেয়ে অগ্রসর নন, বরং অন্তরের গহীনের একটি বিষয়ের (একাগ্রতা, ইখলাস) কারণে তিনি তোমাদের চেয়ে অগ্রসর।”[৫]

রাসূল (ﷺ) একবার স্বপ্নে দেখলেন উমর রাহিয়াল্লাহু আনহুন্ন পরনের কাপড় দৈর্ঘ্যের কারণে মাটিতে ছেঁচড়াচ্ছে। আরেকবার দেখলেন তিনি নিজে একটি পাত্র থেকে দুধ খাওয়ার পর বাকি দুধটুকু উমর পান করছেন। নবিজি (ﷺ) এর অর্থ বলেছেন যে, উমরের মাঝে ইলম ও ঈমানের গুণাবলি রয়েছে।[৬]

রাসূল (ﷺ)-এর জীবদ্দশায় তাঁর নিকটতম দুজন মানুষ ছিলেন আবু বকর ও উমর রাহিয়াল্লাহু আনহুন্মা। নবিজির কবরের পাশেই কবরস্থ হওয়ার সৌভাগ্যও আল্লাহ তাঁদের দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে সব সাহাবির মধ্য থেকে এ দুজনই ছিলেন অন্তরঙ্গতম বন্ধু। তাঁদের মহান শিক্ষক ও প্রশিক্ষকের সাথে তাঁদের ঘনিষ্ঠতা এক অনস্বীকার্য ঐতিহাসিক বাস্তবতা।

তাঁদের জীবনী পড়তে গেলে আমরা অবাক হয়ে দেখি তাঁরা কত নিঃস্বার্থভাবে নিজেদের সম্পদ, জ্ঞান, প্রভাবশালিতা ও শক্তি দিয়ে পরোপকার করেছেন। বাহ্যিক কোনো প্রতিদান ছাড়াই তাঁরা অন্যের উপকার করে গেছেন। শুধু তা-ই না, তাঁদের সাথে অসদাচরণকারীদের ক্ষমা করতেও তাঁরা কার্পণ্য করতেন না।

এই সবকিছুর পরও তাঁরা শত্রুতা থেকে রেহাই পাননি। তাঁদের প্রতি বিষোদগারকারীদের কথাগুলো এতই জঘন্য যে, শুনে হতবাক হয়ে যেতে হয়। আসলে আখিরাতে এই দুজনের জন্য আল্লাহ যে মহান প্রতিদান রেখেছেন, তার তুলনায় দুনিয়ার এতসব শত্রুতা তুচ্ছ হয়ে যায়। আমরা যারা এসব পার্থিব পরীক্ষার সম্মুখীন হইনি, তারা ধৈর্যশীলদের আখিরাতের প্রতিদান দেখতে পেলে ভাবতাম, “ইশ! আমরাও যদি এসব পরীক্ষায় আপতিত হতাম!”

শ্রেষ্ঠতম মানব রাসূল (ﷺ) ও তাঁর নিকটতম সহচর রাহিয়াল্লাহু আনহুন্নদের চরিত্র হননের বৃথা চেষ্টা করে যারা বই লিখে ও প্রচার করে, তাদের দেখে আমাদের একটি বিষয় শেখার আছে। আল্লাহ যাদের অনুগ্রহ করেন, যাদের উপর সবচেয়ে বেশি দয়া করেন, তাঁদের মৃত্যুর পরও তাঁদের প্রতি মিথ্যে অপবাদ আরোপ করা জারি থাকে। এভাবেই আল্লাহ তাঁদের আমলনামা ভারি করতে থাকেন এবং

[৫] আহমাদ বিন হাম্বল, ফাযায়িলুস সাহাবাহ: ১১৮, আবু দাউদ, আয-যুহদ: ৩৭

[৬] সহিহ আল-বুখারি: ৮১, ৩৬৯১, সহিহ মুসলিম: ২৩৯০, ২৩৯১

পাপমোচন করে দেন। যদিও আমরা কখনোই আবু বকর ও উমরের পর্যায়ে যেতে পারব না, তবুও যারা সৎভাবে জীবনযাপন করতে ইচ্ছুক, তাদের জন্য এর মাঝে শিক্ষা রয়েছে। জীবন চলার এই বিশাল শিক্ষাটি দেবার জন্য আমাদের উচিত এই দুজনের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁদের শ্রেষ্ঠতম পুরস্কারে পুরস্কৃত করুন।

সবচেয়ে নিষ্পাপ ও সুখ্যাত ব্যক্তিবর্গও অপবাদের শিকার হন কেন? নিশ্চয় এর পেছনে কোনো উদ্দেশ্য আছে, মতভেদের কোনো বিষয় আছে। মানুষ যখন নিজের মতের ব্যাপারে অন্ধ ও উগ্র হয়ে ওঠে, তারা তখন মানুষকে প্রান্তিকভাবে বিচার করতে থাকে। এই অন্ধরা পৃথিবীকে দুই ভাগে ভাগ করে দেখে। এক অংশ তাদের সমমনা, যারা মানবরূপী ফেরেশতা এবং কোনো ভুল করতে পারে না। আরেক অংশ তাদের সাথে মতভেদকারী, গুণবিহীন মানবরূপী শয়তান। তৃতীয় কোনো পথ নেই। কুসংস্কারাচ্ছন্ন অজ্ঞ লোকেরা পৃথিবীকে এভাবেই দেখে।

এ কারণেই বলা হয় কষ্ট-ক্লেশের মাধ্যমেই ঈমানের আসল পরীক্ষা হয়। এখানেই সত্যিকারের মহানুভবতা, প্রজ্ঞা, উদারতা ও সদাচরণ প্রকাশ পায়। আর সকলেরই যখন মানসিকতা একই রকম হয়, সেক্ষেত্রে আন্তরিক ও ভদ্র হতে কোনো সমস্যা নেই। আবু বকর আর উমর আমাদের দেখিয়েছেন কীভাবে অসদাচরণকারীদের উর্ধ্বে থাকতে হয়। তাঁরা আমাদের শিখিয়েছেন কী করে গালমন্দকারীদের উপেক্ষা করে শ্রেষ্ঠ মানুষদের অন্তর্ভুক্ত হতে হয়, অন্যের ছিদ্রান্বেষণ বাদ দিয়ে কীভাবে নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধনে মনোযোগী হতে হয়।

ভাই ইবনু জিবরিনের চিঠি

কিছুদিন আগে আমি কয়েকটি বিষয়ের নিয়মিত খোঁজখবর রাখতাম। এগুলো কয়দিন পরপরই মাথাচাড়া দিয়ে উঠত। আমি এগুলোর জবাব দেওয়া থেকে বিরত থাকতাম। কারণ এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ অনেক কাজ আছে। সেসব কাজ বাদ দিয়ে এগুলোর পেছনে অতিরিক্ত সময় ও শ্রম নষ্ট করা অনর্থক মনে হতো। কিন্তু পরে আমি খেয়াল করলাম যে, এতে আমি একাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি না। বিষয়টির সাথে জড়িত ব্যক্তির ছাড়াও আরো অনেকের উপর এর প্রভাব পড়ছে। তাই এখন দেখছি এর জবাব দেওয়া জরুরি। কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থে নয়, আমাদের ঈমান ও দ্বীনের স্বার্থেই। আমি বছরের পর বছর ধরে একে যথাসম্ভব এড়িয়ে গেছি। তাৎক্ষণিক জবাব দেওয়া পরিহার করেছি। আসলে আমি এমন একটি সময়ের অপেক্ষায় ছিলাম, যখন জবাব দিলে সেটাকে আত্মপক্ষসমর্থন বলে মনে হবে না। বরং সম্পূর্ণ তাত্ত্বিক আলোচনা বলে পরিগণিত হবে।

সম্মানিত শাইখ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান আল-জিবরিনের কাছ থেকে একটি চিঠি পেয়ে বুঝলাম যে, সেই সময় চলে এসেছে। আশা করি আল্লাহ এই কথাগুলো থেকে আমাদের সবাইকে উপকৃত করবেন। ইবনু জিবরিন বেশ কিছু প্রশ্ন পেয়েছিলেন এক অতি-জজবাওয়ালা যুবকের কাছ থেকে। সেগুলোই তিনি আমাকে চিঠি আকারে পাঠান। যুবক ভাইটির সব বক্তব্যের সারকথা মূলত দুটি প্রশ্ন। আমি এগুলোরই উত্তর দিতে চাচ্ছি। প্রশ্নকর্তা লিখেছেন:

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

সম্মানিত শাইখ আব্দুল্লাহ আল-জিবরিন অনুগ্রহ করে এই প্রশ্নগুলোর জবাব দিয়ে বাধিত করবেন:

১। জনৈক ফাসিক সঙ্গীতশিল্পীর ব্যাপারে এক ব্যক্তি বলেছে, “সে তাওবাহ না করলে আল্লাহ তাকে কখনোই ক্ষমা করবেন না। কারণ নবিজি (ﷺ) বলেছেন, ‘আমার উম্মাতের সকলকে ক্ষমা করা হবে, শুধু নিজের গুনাহর কথা প্রকাশ করে বেড়ানো ব্যক্তির ছাড়া।’ তার মানে এই লোকের জন্য কোনো অজুহাত নেই,

কারণ সে তার কাজের মাধ্যমে মুরতাদ হয়ে গেছে। তাওবাহ না করলে সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী। আল্লাহ আমাদের এমন পরিণতি থেকে রক্ষা করুন। সে তো আল্লাহর এই আয়াতই বিশ্বাস করে না: ‘জিনার কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয় এটি জঘন্য ও ঘৃণ্য আচরণ।’ আল্লাহর কসম! যে কেউ এই আয়াত জানে, সে কখনোই এটা হাজার-লক্ষ মানুষের সামনে ফলাও করে বেড়াবে না।” সে যে এই কথাটা বলল, এখন তার ব্যাপারে শরিয়তের হুকুম কী? সে কি খারেজি [৭] নয়, হে শাইখ? আমাদের কি উচিত নয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওয়াস্তে মুসলিম উম্মাহকে এর বিরুদ্ধে সতর্ক করা? আর এমনটা করার সময় কি তার নাম উল্লেখ করা যাবে? উল্লেখ্য, তাকে তার আচরণ ঠিক করতে নসিহত করা হয়েছে। কিন্তু সে কথা শোনে না।

২। হাদিসে বর্ণিত তায়িফা মানসুরা (সাহায্যপ্রাপ্ত দল) ও ফিরকায়ে নাজিয়া (৭৩ দলের মধ্যে একমাত্র জান্নাতি দল) এই দুটিকে এক ব্যক্তি আলাদা মনে করে। আরো দাবি করে যে, শাইখ আব্দুল আযীয বিন বাযেরও একই মত। এই লোকের ব্যাপারে শরিয়তের হুকুম কী? উল্লেখ্য, শাইখ বিন বাযকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি এর বিপরীত কথা বলেছেন।

ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

শাইখ আব্দুল্লাহ বিন জিবরিন তাঁর চিঠিতে নিজের এই মন্তব্যগুলো কষ্ট করে যোগ করে দিয়েছেন:

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আমি এই বিষয়টি সম্মানিত শাইখ সালমান বিন ফাহদ আল-আওদাহর কাছে পাঠানো বিধেয় মনে করছি। এ ব্যাপারে তিনি বিশেষজ্ঞ, তাই তিনিই এর উত্তর দেওয়ার বেশি উপযুক্ত। প্রশ্নকর্তা যদি সত্যিই সত্যসন্ধানী হন, তাহলে নিঃসন্দেহে তিনি শাইখের উত্তরে সন্তুষ্ট হবেন। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন। ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান আল-জিবরিন, ২২/১২/১৪২২

[৭] এরা একটি ভ্রান্ত গোষ্ঠী, যারা মনে করে কোনো মুসলিম কবির গুনাহ করলেই কাফির হয়ে যায়।

আমি সত্যিই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে ইচ্ছুক। আমি প্রশ্নকর্তার অনুভূতিতে আঘাত করব না। আল্লাহর অনুগ্রহে এই বিষয়টি কেবল স্পষ্ট করে দিতে চাই, যাতে ভুল বোঝার অবকাশ না থাকে। প্রথম প্রশ্নের বক্তব্যটি আমিই এক গায়কের ব্যাপারে বলেছিলাম আমার এক খুতবায়।

সম্মানিত ভাইটি বলেছেন যে, বক্তাকে (অর্থাৎ, আমাকে) তার আচরণের ব্যাপারে সতর্ক করা হলেও সে কথা শোনেনি। মনে হয় তিনি আমার বক্তব্যকে ভুল বুঝেছেন। তিনি ভেবেছেন যে, আমি সকল গুনাহগার মুসলিমকে কাফির মনে করি। আমি স্বীকার করছি যে, প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে আমার বক্তব্যটি শুনলে যে কেউই এমন অর্থই বুঝবে। অথচ এটা কারো অজানা নয় যে, আমি এক তাৎক্ষণিক বক্তব্যে শ্রোতাদের সামনে এই কথাটি বলেছি। এখানে খুঁটিনাটি বা বক্র কোনো অর্থ বের করার দরকার নেই। সাধারণভাবে যা বোঝায়, তাই বুঝতে হবে। ইসলামের আলিমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, কারো বক্তব্য থেকে স্পষ্ট ও সাধারণভাবে কোনো অর্থ প্রকাশ পেলে এর বিপরীত কোনো অস্পষ্ট অর্থ খোঁজা যাবে না। ‘আল-আওয়াসিম ওয়াল-কাওয়াসিম’ গ্রন্থে ইমাম ইবনুল ওয়াযির এই মূলনীতিটি আলোচনা করে বলেছেন যে, এ ব্যাপারে আলিমদের ইজমা আছে।

বক্তার অবস্থা ও তার সর্বজনশ্রুত বক্তব্যগুলো থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় তিনি ওই খুতবায় কী বোঝাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কারো যদি আরো নিশ্চিত হওয়ার প্রয়োজন হয়, আমি এখন বলছি: “হারামকে হালাল বলে ঘোষণা না করলে কোনো মুসলিম কেবল গুনাহ করার কারণে কাফির হয় না। খারিজি ও তাদের অনুসারী গোষ্ঠীগুলো ছাড়া আর কেউই এর সাথে দ্বিমত করে না। খারিজিরাই কেবল মুসলিমদের হত্যা, তাদের সম্পদ আত্মসাৎ ও সম্মানহানি করার বাহানা খোঁজে।

এই গোষ্ঠীটি ভ্রান্ত এবং তাদের অনুসারীদের স্বরূপ স্পষ্ট। কারো বক্তব্যের মধ্যে জোর করে লুকানো অর্থ বের করে তাকে তাদের দলে ফেলার চেষ্টা করার কোনো দরকার নেই। একজন মুসলিমকে সাধারণভাবে ঈমানদার বলেই বিবেচনা করতে হয়। কাজেই কোনো মুসলিম যদি নিজেকে খারিজিদের থেকে দায়মুক্ত ঘোষণা করে, তাহলে সেটাই বিশ্বাস করতে হবে। আর তার অন্তরের বিষয় আল্লাহর হাতে ছেড়ে দিতে হবে। কথার যেই অর্থ তিনি বোঝাতে চাননি, তা জোর করে তাঁর মুখে তুলে দিয়ে তারপর নিন্দা করার দরকার নেই।

নবিজি (ﷺ) তাবুক যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর মুনাব্বিকরা তাঁর কাছে গিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার বিভিন্ন মিথ্যে অজুহাত শোনাতে লাগল। তিনি তাদের ওজর

গ্রহণ করে নেন, তাদের জন্য মাগফিরাতের দু'আ করেন, আর তাদের অন্তরের ব্যাপার আল্লাহর হাতে ছেড়ে দেন। মুসলিমদের উচিত দ্বীনি ভাই হিসেবে একত্র থাকা এবং পারস্পরিক আচরণে এই ধরনের সদাচরণ দেখানো। একে অপরের প্রতি সর্বোচ্চ সুধারণা করার জন্য বাহানা খুঁজতে হবে, তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করতে হবে, আর অন্তরের গোপন বিষয় আল্লাহর কাছে ন্যস্ত করে দিতে হবে।

প্রশ্নকর্তা যে অর্থ বুঝেছেন, আমি আসলে সেটি বোঝাইনি। ওই সঙ্গীতশিল্পী ব্যভিচার করতে পছন্দ করে বলেই আমি এমন কথা বলেছি, তা নয়। বরং সে এই ঘৃণ্য কাজটির প্রশংসা করে, ব্যভিচার ও ব্যভিচারীদের গুণগান করে, ব্যভিচার পরিহারকারী ব্যক্তিদের পুরুষত্ব নিয়ে বিদ্রূপ করে। কেবল গুনাহ করার চেয়ে এটা একদমই আলাদা।

একজন মানুষের মুখের কথা তার মনের ভাবের ছায়ামাত্র। অর্থ যদি পরিষ্কার বোঝা যায়, তাহলে শব্দচয়নে সামান্য বা মারাত্মক ভুল করলেও তা ক্ষমার যোগ্য।

আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এক লোকের কথা বলেছেন, যে খুশির চোটে ভুলে বলে ফেলেছিল, “হে আল্লাহ! আপনি আমার বান্দা আর আমি আপনার প্রতিপালক!” শব্দচয়নে ভুল করলেও সে গুনাহগার হয়নি।

কারো কোনো বক্তব্য প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে বা অতিরিক্ত ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে প্রচার করা যাবে না। বিশেষত বক্তৃতা বা লেখার উদ্দেশ্য যদি থাকে নসিহত করা ও জনগণের কল্যাণসাধন, তাহলে শ্রোতা বা পাঠকের উচিত নয় বক্তা বা লেখকের টুটি চেপে ধরার উদ্দেশ্যে লুকানো অর্থ খুঁজতে শুরু করা।

খারিজিদের দুটো প্রধান দোষ ছিল। দুটোই একই রকমের মারাত্মক এবং এদের একটি অপরটিকে শক্তিশালী করে। প্রথমত, ঈমানের বিষয়গুলোতে কঠোরতা, যেটাকে তারা ইসলামি শরিয়তের পবিত্রতার প্রতি ভক্তি ভেবে ভুল করত। পাপাচারী ব্যক্তিকে কাফির ভেবে তারা অবিচার করত। দ্বিতীয় দোষটি প্রথমটি থেকেই উদ্ভূত। তারা অপর মুসলিম ভাইয়ের প্রতি আক্রমণাত্মক ও সহিংস আচরণ করত। এমনকি তাদের জীবন, সম্পদ ও সম্মান হরণ করা নিজেদের জন্য হালাল করে নিয়েছিল।

আল্লাহর কাছে শোকর যে, মুসলিমদের বিরাট অংশটি খারিজিদের চরমপন্থাকে প্রত্যাখ্যান করে। তারা পাপাচারী মুসলিমকে কাফির বলে না। চরমপন্থা

অবলম্বনকারী মানুষের সংখ্যা একেবারেই নগণ্য। আল্লাহ আমাদেরকে এই মানুষদের ক্ষতি থেকে রক্ষা করুন।

দুর্ভাগ্যবশত, কিছু মানুষ বাঁকা অর্থ বের করার মাধ্যমে অপর মুসলিম ভাইয়ের জীবন ও সম্পদের প্রতি জুলুম করে। এটা বিপজ্জনক স্বভাব। আমি এদের ব্যাপারে প্রচুর লেখালেখি করেছি এবং মানুষকে তাদের ব্যাপারে সাবধান করেছি।

আর কিছু লোক এমন আছেন, যারা সঠিক বুঝ-জ্ঞানের অধিকারী এবং খারিজিদের চিন্তাধারাকে চরমভাবে প্রত্যাখ্যানকারী। কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার হলো, খারিজিদের একটি গুণ তাঁরা রপ্ত করে নিয়েছেন। তাঁদের সাথে মতপার্থক্যকারীদের প্রতি তাঁদের আচরণ কঠোর এবং তাদের ভুল খুঁজে বের করতে তাঁরা বেশ তৎপর। কী সহজেই না তাঁরা অপরকে বিদআতি, ভ্রান্ত, মুরজিয়া [৮] বা খারিজি বলে ফেলেন! প্রায়ই এসব কথা তাঁরা বলেন স্বল্প বুঝ ও অগভীর জ্ঞানের কারণে। বিশেষ কারো সাথে মিত্রতা ও অপর কারো সাথে শত্রুতার কারণেই তারা এসব সিদ্ধান্তে পৌঁছান। যুবকদের মধ্যে যাদের এই অভ্যাস আছে, তারা এসব ব্যাপারে তুমুল বিতর্ক করতে করতেই জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সময়টা ব্যয় করে ফেলে। অথচ এটা ইলম বৃদ্ধি করা ও চরিত্র উন্নয়নের সময়।

মানুষের ভুল সংশোধন করে তাদের সামনে সত্য উন্মোচিত করা হলো জ্ঞানী ও যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের কাজ। এদের এ ব্যাপারে জ্ঞানও আছে, সঠিকভাবে কাজটি করার মতো প্রজ্ঞাও আছে। আল্লাহ বলেন,

﴿٦٥﴾ آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا

“তার প্রতি আমি অনুগ্রহ করেছি এবং তাকে দিয়েছি আমার পক্ষ থেকে বিশেষ জ্ঞান।” (সূরাহ আল-কাহফ ১৮:৬৫)

জ্ঞানী লোকেরা বুঝতে পারেন যে, দরকারি হলেও অনেক কাজের ফলাফল আসলে শূন্য। বিশেষত এমন একটা সময়ে, যখন মুসলিমদের আসল শত্রু হলো তাদের ভূমি ও সম্পদের উপর নেমে আসা শক্তিশালী দখলদার শত্রুবাহিনী।

সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার হলো অপরের কাছে ইসলামের বার্তা পৌঁছে দিতে আমাদের ব্যর্থতা। আমরা যখন নিজেদের মাঝে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে নিষ্ফল

[৮] আরেকটি ভ্রান্ত দল, যারা খারিজিদের একদম বিপরীত মত পোষণ করতো। তাদের মতে, একজন মানুষ যত ভালো বা খারাপ আমলই করুক, ঈমানের উপর এর কোনো প্রভাবই পড়ে না।

বাগড়াঝাটিতে লিপ্ত, তখনও পৃথিবীতে অনেকে অমুসলিম রয়ে গেছে। এদের মাঝে অনেকের কাছেই এখনও কেউ ইসলামের সঠিক বার্তা নিয়েই যায়নি।

এই দুটি বিষয়ই আমাদের সব চেষ্টা-আগ্রহের মূল কেন্দ্রবিন্দু হওয়া উচিত। আমাদের একে অপরকে আক্রমণ করা বাদ দিয়ে নিজেদের মাঝে নমনীয় ও ক্ষমাশীল হতে হবে এবং সর্বোচ্চ সুধারণা রাখতে হবে। কঠোরতা পরিহার করতে হবে। আর যারা বিশেষ কোনো ইসলামি কর্মীর মর্যাদা রক্ষায় নিয়োজিত থাকার দাবি করেন, তাদের বলব, আপনারা ভালো কাজ করেছেন। তবে এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো ইসলাম ও ঈমানের প্রতিরক্ষার্থে কাজ করা এবং মুসলিমদের দুরবস্থা দূর করতে সচেষ্ট হওয়া। অমুসলিমদের ইসলামের দিকে আহ্বান করা, দ্বীনের খেদমতে গঠনমূলক কিছু করা এবং বৃহৎ অর্থে, মানবজাতির কল্যাণার্থে পৃথিবীর উন্নয়নে ভূমিকা রাখা।

আমার ব্যাপারে কুধারণা রেখেও যদি কেউ বিশুদ্ধ তাওহীদ অন্তরে নিয়ে মারা যায়, তাতে কোনো সমস্যা নেই। বরং সমস্যা হবে যদি সে আল্লাহ, তাঁর দ্বীন, শরিয়ত, কিতাব ও নবি-রাসূলগণের ব্যাপারে অজ্ঞ অবস্থায় মারা যায়। ইসলামের জন্য আমরা যেসব কাজ করি, তা বিভিন্ন কারণে খুবই সীমিত। তাহলে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী কাজগুলোতে আগে মনোযোগ দেওয়াটাই কি উচিত নয়?

আমাদের জজবাতি প্রশ্নকর্তা ভাই দ্বিতীয় যে বিষয়টি তুলে ধরেছেন, তা হলো আমি ফিরকায়ে নাজিয়া ও তায়িফা মানসুরাকে আলাদা মনে করি। তিনি আরো বলেছেন যে, আমি বিন বাযকে আমার সাথে এ ব্যাপারে একমত বলে দাবি করলেও তাঁর মত আসলে ভিন্ন।

এই বিষয়ে ইজতিহাদ ও গবেষণা করতে কোনো দোষ নেই, কারণ এই বিষয়টিতে অনুধাবনের অনেক কিছু আছে। তবুও এটা বড় কোনো ব্যাপার নয়। বিভিন্ন আলিম বিভিন্ন হাদিসের অর্থের মাঝে তুলনা করে একাধিক সিদ্ধান্তে এসেছেন, এটাই মূল কথা। যেমন- আত-তাহাওয়ি, ইবনু কুতাইবাহ, ইবনু হাজার, ইবনু তাইমিয়াহ, ইমাম নববি প্রমুখ। মুফাসসিরগণ যেমন বিভিন্ন আয়াতের অর্থের মাঝে তুলনা করেন, এখানেও ব্যাপারটা একই রকম। এসকল কাজে অনেকসময় সিদ্ধান্তহীনতা বা অনিচ্ছাকৃত ভুল সিদ্ধান্ত তৈরি হয়। মুসলিমরা এতে কখনো দোষী হয় না। কারণ নবিজি (ﷺ) বলেই দিয়েছেন ইজতিহাদকারী আলিম সঠিক সিদ্ধান্তের কারণে দুই নেকি ও ভুল সিদ্ধান্তের কারণে এক নেকি লাভ করবেন।

আমরা যা নিয়ে কথা বলছি, এর চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলিমগণ আলোচনা করেছেন। যেমন ধরুন ইসলাম ও ঈমানের অর্থ। কেউ বলেছেন দুটো

একদমই সমার্থক, কেউ বলেছেন একদমই আলাদা, কেউ আবার বলেছেন আংশিক আলাদা। প্রতিটি মতের পক্ষেই প্রখ্যাত সব আলিম রয়েছেন। তাঁদের কেউই সমালোচনার পাত্র হয়ে যাননি, কারণ এগুলো খুবই তাত্ত্বিক আলোচনা। ইবনু তাইমিয়াহ (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর ‘কিতাবুল ঈমান’ গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন।

‘রাসাইলুল গুরাবা’ বইয়ে আমি যে মত দিয়েছি, তা মূল পাঠের ব্যাখ্যা হিসেবে এসেছে। আমি এ ব্যাপারে আমার মতকে সঠিক বলে মনে করি, তবে তা ভুল হওয়ার সম্ভাবনাও স্বীকার করি। একইভাবে, আমি এ ব্যাপারে প্রশ্নকর্তা ভাইয়ের মতকে ভুল মনে করি, তবে তা সঠিক হওয়ার সম্ভাবনাও স্বীকার করি। এ ব্যাপারে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেই। যেহেতু এ ব্যাপারে ইজমা নেই, তাই আলোচনার দুরার খোলাই আছে।

এ ব্যাপারে যারা আমার কথা উদ্ধৃত করে, তারা এমনভাবে দেখায় যেন আমি ফিরকায়ে নাজিয়া আর তায়িফা মানসুরাকে একেবারেই আলাদা দুটি দল মনে করি। আসলে ব্যাপারটা এমন নয়। আমার মতে ফিরকায়ে নাজিয়া হলো তায়িফা মানসুরার তুলনায় আরো বিস্তৃত একটি ব্যাপার। তায়িফা মানসুরা হলো ফিরকায়ে নাজিয়ার অংশ। দুনিয়ায় আসমানী সাহায্য না পেয়েও অনেক মুসলিম নাজাত পায়। সাহাবিদের মধ্যে যারা পরস্পরের সাথে মতভেদ ও লড়াই করেছেন, তাঁদের সকলেই নাজাতপ্রাপ্ত। কিন্তু সকলেই দ্বন্দ্বের সময় ঐশী সাহায্য পাননি। আগ্রহীদের আমি বলব এ ব্যাপারে ইবনু তাইমিয়াহর লেখা পড়তে। (আল-ফাতাওয়া, ৪/৪৪৩-৪৫০ এবং ৪/৪৬৭-৪৭০)

আমার মতের পক্ষে কুরআন থেকে সমর্থন রয়েছে। আল্লাহ বলেন,

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي
الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

“মুমিনদের সকলের একত্রে অভিযানে বেরিয়ে পড়া সমীচীন নয়। তাদের প্রতিটি দলের (ফিরকা) একটি অংশ (তায়িফা) যেন পৃথক হয়, যাতে করে তারা দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞানের অনুশীলন করতে পারে এবং ফিরে আসার পর তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে যাতে তারা (অসদাচরণ) থেকে বিরত হয়।” (সূরাহ আত-তাওবাহ ৯:১২২)

এই আয়াতে দেখা যাচ্ছে তায়িফার চেয়ে ফিরকা বেশি বিস্তৃত। আরবি ভাষায় তায়িফা বলতে ফিরকার চেয়ে ছোট দল বোঝানো হয়। এমনকি একজন ব্যক্তি

নিয়েও তায়িফা গঠিত হতে পারে, যেমনটা এই আয়াতের ব্যাপারে কিছু মুফাসসির বলেছেন,

وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

“আর মুমিনদের একটি দল (তায়িফা) যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।”
(সূরাহ আন-নূর ২৪:২)

আমার মতের পক্ষে আরো দলীল আছে। এই শব্দদুটোর অর্থই কেবল আলাদা নয়, এদের বিশেষণও আলাদা। একটির বিশেষণ ‘নাজাতপ্রাপ্ত’, আরেকটির বিশেষণ ‘সাহায্যপ্রাপ্ত’। ভাষার সাধারণ নিয়ম হলো গাঠনিক এই পার্থক্য অর্থের পার্থক্য নির্দেশ করে। আর আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

যা-ই হোক, আমি কখনোই বলিনি ফিরকায়ে নাজিয়া আর তায়িফা মানসুরা সম্পূর্ণ আলাদা দুটি দল। আমি কেবল বলেছি যে, তায়িফা মানসুরা হলো ফিরকায়ে নাজিয়ার অংশ। কিছু মানুষ কিছু ভুল করলেও এবং ঐশী সাহায্য না পেলেও পরকালে নাজাত পাবেন। আর কিছু মানুষ উভয়টিই পাবেন।

অন্যান্য লেখায় আমি এই বিষয়ে গভীরতর আলোচনা করেছি বলে এখানে আর কথা বাড়ানোর প্রয়োজন দেখছি না। যারা বলেন দুটি শব্দবন্ধই একই অর্থ প্রকাশ করে, তাঁদেরও শক্ত দলীল রয়েছে।

সিলসিলাহ আল-আহাদিস আস-সহীহাহ^[৯] গ্রন্থে শাইখ নাসিরুদ্দিন আলবানি লিখেন,

আর আমাদের এক দ্বীনি ভাই বলে থাকেন এই দুটি দলের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। এটি তাঁর মত এবং আমি একে সত্য থেকে বেশি দূরবর্তী মনে করি না। আগেই বলা হয়েছে যে, মুহাদ্দিসগণের মতে তায়িফা মানসুরা হলো হাদিসের আলিমগণ। অথচ ফিরকায়ে নাজিয়ার বেশিরভাগই আলিম নন, হাদিসের আলিম তো ননই।

নবিজি (ﷺ)-এর সাহাবাগণ হলেন ফিরকায়ে নাজিয়ার শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। এ কারণেই তো আমাদের আদেশ করা হয়েছে তাঁদের সুন্নাহ অনুসরণ করতে। অথচ তাঁদের বেশিরভাগই আলিম ছিলেন না। তাঁরা তাঁদের মধ্যকার অল্পসংখ্যক আলিমের অনুসরণ করতেন।

[৯] আল-আলবানি, সিলসিলাহ আল-আহাদিস আস-সহীহাহ, ১/৯৩২

কাজেই এ কথা পরিষ্কার যে, তায়িফার চেয়ে ফিরকা আরো বিস্তৃত। একইসাথে, এ নিয়ে বিতর্ক করার মাঝে আমি কোনো কল্যাণ দেখি না। আমাদের বরং নিজেদের মধ্যকার ঐক্য রক্ষা ও ইসলামের জন্য কাজ চালিয়ে যাওয়া বেশি জরুরি।

আমি স্বীকার করি যে, ‘মানসুরা’ এবং ‘নাজিয়া’ শব্দদ্বয় কিছুটা হলেও সমার্থক। কারণ নাজাত পাওয়ার কারণগুলো একত্রিত হলেই সাহায্য পাওয়া সম্ভব। একইভাবে, ঐশী সাহায্য তাঁরই পান, যারা নাজাতের পথে থাকেন। কাজেই, দুটি শব্দের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, এগুলো হুবহু একই। হুবহু একই হওয়ার সম্ভাবনা আছে, যেমনটা কিছু চিন্তাবিদ মনে করে থাকেন। আবার একটার চেয়ে আরেকটা সাধারণ হওয়ার সম্ভাবনাও আছে, যে মতটিকে আমি অগ্রাধিকার দিই। মোট কথা, একটি শব্দ অপরটি থেকে বেশি বিস্তৃত হলেও দুটির মাঝে সাধারণ সমার্থকতার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

প্রশ্নকর্তার মতটি যদি আমরা গ্রহণ করেও নিই, অর্থাৎ ‘মানসুরা’ ও ‘নাজিয়া’র অর্থ হুবহু একই ধরে নিই তবুও আমার মনে হয় গভীরতার দিক দিয়ে দুটির মাঝে কিছুটা হলেও পার্থক্য থাকবে। আহলুস সুন্নাহর অনেক আলিমের মতে, অর্থ একই হলেও দুটি শব্দের অর্থের গভীরতার মাত্রা আলাদা হতে পারে। কোন প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে, তার ভিত্তিতে শব্দগুলোর অর্থ বিভিন্ন মাত্রা ধারণ করতে পারে। আলিমগণ একমত যে, প্রসঙ্গ সহ ও প্রসঙ্গ ছাড়া বিবেচনা করলে একই কথার ভিন্ন অর্থ হতে পারে।

মুমিনদের মাঝে তাকওয়া ও আমলে যে পার্থক্য আছে, তা তো অনস্বীকার্য। জান্নাতের অনেক স্তর আছে। দুনিয়ায় অর্জন করা সাওয়াবের ভিত্তিতে একেক মুমিন একেক স্তরে থাকবে। নবিগণের আলাদা স্তর, সিদ্দিকগণের আলাদা, শহীদগণের আলাদা, সলিহ (সৎকর্মশীল) লোকদের আলাদা। এর বাইরেও অন্যান্য স্তরের মুমিন জান্নাতে থাকবে। কেউ বিনা বিচারে জান্নাতে যাবে। কেউ জাহান্নামে কিছু সময় কাটিয়ে তারপর জান্নাতে ঢোকার অনুমতি পাবে। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন,

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، أَرَاهُ فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ

“আল্লাহর রাস্তায় যারা জিহাদ করে, তাদের জন্য আল্লাহ জান্নাতে একশটি স্তর সজ্জিত করেছেন। একেকটির মধ্যকার দূরত্ব আসমান ও জমিনের মধ্যকার দূরত্বের মতো। কাজেই জান্নাতের জন্য দু’আ করার সময় আল-ফিরদাউসের জন্য দু’আ করবে। কারণ এটি জান্নাতের উচ্চতম ও কেন্দ্রীয় স্থান। এর উপর দয়াময় আল্লাহর আরশ এবং এ থেকে জান্নাতের নদীসমূহ প্রভাবিত হয়।”[১০]

জান্নাতের স্তরবিন্যাস নির্ণয় করতে আলিমগণ বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। শিষ্টাচার ও সচ্চরিত্র নিয়ে গবেষণাকারী আলিমগণ এ কাজে রত হয়েছেন। স্তর নির্ধারণের গুণাবলি ও সেগুলোর খুঁটিনাটি বিভিন্নজন বিভিন্নভাবে গ্রহণ করেছেন বলে তাঁদের মাঝে মতপার্থক্য হয়েছে।

ইসলামি শরিয়তের একটি গুরুত্বপূর্ণ মূল প্রতিপাদ্য হলো ন্যায়। প্রতিটি বস্তুকে তার যথাযথ স্থানে রেখে এবং প্রত্যেককে তার প্রাপ্য অধিকার দিয়ে এই ন্যায় অর্জিত হয়। মানুষের ঈমান ও আমলের স্তর বিভিন্ন। কেউ যেই স্তরে পৌঁছায়, তার উপরের স্তরে যাবার জন্য তার পরিশ্রম করা উচিত। আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾

“আর যারা আমার পথে চেষ্টা-সাধনা করে, আমি অবশ্যই তাদের আমার দিকে পথ দেখাব। নিশ্চয়ই আল্লাহর সৎকর্মশীলদের সাথে আছেন।”

(সূরাহ আল-আনকাবূত ২৯:৬৯)

শেষ কথা হলো, আমাদের উচিত উপকারী জ্ঞান অর্জনে ব্যস্ত হওয়া ও এই ইলমের মর্যাদা বোঝা। একে অপরের সাথে তর্ক করে নিজেদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হওয়ার জন্য এই জ্ঞান ব্যবহার করা উচিত নয়।

ঈমান সবার আগে

আমি আমার সমালোচকদের কথার জবাব দিই না, এই অভিযোগ করে অনেকে আমার কাছে চিঠি লিখেন। তাদের দাবি, এমনটা করা সবসময় ঠিক নয়। তারা বলেন যে, সমালোচকরা প্রায়ই আমাকে ভুল বুঝেন। আমি যদি একটু সময় নিয়ে বিষয়টা পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করে দিতাম, তাহলেই অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যেত।

নিঃসন্দেহে নিজের সুনাম রক্ষা করা প্রত্যেকের অধিকার, তবে দায়িত্ব নয়। আত্মপক্ষসমর্থনের পেছনে অনেক সময় যায় এবং অন্য অনেক কাজ থেকে মনোযোগ সরে যায়। ইসলাম, মুসলিম ও মানবতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে ঠিকমতো শ্রম ও সময় দেওয়া যায় না।

এতে করে নিন্দুকের মনের আগুনও নেভে না, সমস্যাও সমাধান হয় না। বরং আগুনে আরো ইন্ধন জোগায়। নিন্দুকেরা অবশ্যই পাল্টা জবাব দিয়ে আপনার বক্তব্যের দুর্বল দিকগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করবে। আত্মপক্ষ সমর্থনের মাধ্যমে তো আপনি স্বীকার করে নিলেন যে, দুটো পক্ষ এখানে বিরোধে লিপ্ত আছে। তার চেয়ে ভালো হয় একটি মাত্র পক্ষকেই আক্রমণে ব্যস্ত থাকতে দিয়ে নিজে এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত হয়ে যাওয়া। দিন শেষে যা সঠিক, তা তো সঠিকই।

পৃথিবীতে কমপক্ষে চার বিলিয়ন মানুষ এখনও তাদের রব্বকে ঠিকমতো চেনে না। তাদের অনেকেই আবার তাঁর অস্তিত্ব পর্যন্ত অস্বীকার করে। আমাদের কি উচিত না এই মানুষগুলোকে সঠিক ব্যাপারগুলো বোঝাতে ব্যস্ত থাকা?

এছাড়াও আছে এক বিলিয়নের চেয়ে বেশি মুসলিম। তাদের মাঝে অজ্ঞতা ব্যাপক। চারিদিকে বিদআতের ছড়াছড়ি। কোনো কোনো মুসলিম কবর-মাজার আর পীর-আউলিয়ার পূজা করে। অনেকে ব্যভিচার-অশ্লীলতা আর সুদের কারবারে জড়িত। অনেক জায়গায় মুসলিমরা জালিম শাসক আর নাস্তিক সরকারের অত্যাচারে পিষ্ট হচ্ছে। তাদের হত্যা করা হচ্ছে, নারীরা হচ্ছে লাঞ্ছিত। ইসলাম থেকে দূরে সরে গিয়ে মুসলিমরা ভ্রান্তি ও পাপে নিমজ্জিত এক জীবন যাপন করছে।

আল্লাহর মনোনীত এই উম্মাহর ব্যাপারে আমি নিরাশ হচ্ছি না। সকল সীমাবদ্ধতা সাথে নিয়েই মুসলিমরা আমাদের অন্তরে আছে, আমরা তাদের ইসলামি পরিচয়কে স্বীকৃতি দেই। যারা অজ্ঞতাবশত শির্কে লিপ্ত হয়েছে, আমরা তাদের অন্তরে ইসলামের অস্তিত্ব স্বীকার করি এবং তাদের অজ্ঞতাকেই শুধু দোষারোপ করি। আল্লাহর দয়া সবকিছুকে বেঁটন করে রাখে। আমরা দু'আ করি আমাদের গুনাহের কারণে আমরা যেন তাঁর রহমত থেকে বঞ্চিত না হই। কোনো মুসলিমেরই এমন পরিণতি আমরা চাই না।

আমরা আশা করি আমরা আমাদের সমালোচকদের মাধ্যমে উপকৃত হবো। তাদের কারণে আমরা আমাদের ভুলত্রুটিগুলোর দিকে নজর দিতে পারি। নবিজি (ﷺ) বলেছেন,

كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ

“আদমের সকল সন্তানই গুনাহগার, উত্তম গুনাহগার হলো সে, যে তাওবাহ করে।” [১১]

সমালোচক যদি আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী হয়, আমরা বলি, “আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে রহম করুন, যে আমাদের ভুল ধরিয়ে দেয়।” আর নিন্দুক যদি কেবল আমাদের ঘৃণাই করে, তাহলে আমরা কবির সাথে গলা মিলিয়ে বলি,

আমার শত্রুরা তো আমার জন্য রহমত।

হে প্রতিপালক! তাদের দূরে রেখো না।

তারা আমার ভুল ধরে সংশোধনের আশায়।

প্রতিযোগিতায় করে উন্নয়নের আশা।

কিছু মানুষ সমালোচনার জবাব দিতে গিয়ে নিজের ভুলের উপর আরো বেশি গেঁড়ে বসেন। এটি তাঁদের আত্মবিশ্বাসের অভাব। আবার অনেকে সমালোচনা থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য সঠিকটা বাদ দিয়ে ভুল কথা বলেন। এটা কেবল দুর্বলতাই নয়, সুস্থ মানসিকতার অভাবও বটে।

সমালোচকদের থেকে আমরা যেভাবে উপকৃত হই, তার একটি হলো সমালোচনার প্রতি অভ্যস্ত হওয়া। আমরা অপমান ও কটু কথা সহ্য করতে শিখি, অভিযোগ আসলে কীভাবে সঠিক আচরণ করতে হয় সেটা শিখি। এটা আমাদের নিজেদের জন্যই ভালো। কারণ জীবনে একসময় না একসময় এগুলো আসতই। সারাক্ষণ প্রশংসা শুনতে অভ্যস্ত ব্যক্তি হঠাৎ সমালোচনার মুখোমুখি হলে সহ্য করতে পারবে না, তা যতই গঠনমূলক হোক না কেন। অতিরিক্ত প্রশংসা মানুষকে আত্মতুষ্টি ও অহংকারী করে তোলে।

আমরা চাই সারা বিশ্বের মুসলিমরা যেন তাদের দীন ছাড়া অন্য কোনো কিছুর প্রতি রক্ষণাত্মক না হয়। শুধু হকের পক্ষেই ব্যস্ত থাকতে হবে। নিজের ব্যাপারে বা প্রিয়জনের ব্যাপারে মিথ্যে অপবাদ ছড়াতে দেখলে আত্মসংবরণ করতে হবে, এমনকি মানুষ যদি সেসব অপবাদ বিশ্বাস করতে শুরু করে তবুও। এটা খুবই ছোট বিষয়। অমুক-তমুকের আলোচনা কখনোই তর্ক-বিতর্কের বিষয় হওয়া উচিত নয়। এসব জিনিস থেকে দূরে থাকাই শ্রেয়।

আমরা আরো চাই মুসলিমরা উপকারী কাজে মগ্ন থাকুক। ইসলাম শেখা, শেখানো ও মানুষকে এর দিকে আহ্বান করা; মানবতার সেবা; সংস্কারসাধন—এসবেই আমাদের মননিবেশ করা উচিত। আমাদের উচিত সাধারণভাবে সকল মুসলিমের সাথে মিত্রতা পোষণ করা এবং স্থান নির্বিশেষে ভালো কাজে সবাইকে সহযোগিতা করা। আমাদের অবশ্যই মিডিয়া, অর্থনৈতিক ও সামাজিক শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। আমাদের সামর্থ্য, দক্ষতা ও সৃষ্টিশীলতা বাড়াতে হবে।

তুচ্ছ বিবাদ-দ্বন্দ্ব যেন আমাদের সামান্যতম মনোযোগও না পায়। এগুলো আমাদের মনকে চাঙাও করে না, চিন্তার উন্নয়নও করে না। এগুলোর কোনো গঠনমূলক প্রভাবই নেই। মুসলিমদের মাঝে এগুলোর মাধ্যমে না ভালোবাসা তৈরি হয়, না কোনো ইতিবাচক সংস্কার হয়।

কেউ যদি ফিরআউন ও তার দোসরবাহিনী, আবু জাহেল, আবু লাহাবদের মতো কাউটা কাফিরদের গালমন্দ করার পেছনেও সারাটি সময় ব্যয় করে, তাহলে সেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজে অবহেলা করল। যেমন- আল্লাহর যিকির করা। ওইসব লোকের ব্যাপারে আপনি কিছুই জানেন না, এমন অবস্থাতেই আপনি মারা গেলেন, তারাপরও আপনার পক্ষে জান্নাতের উচ্চতম স্তরে পৌঁছানো সম্ভব। এ কারণেই রাসূল (ﷺ) বলেছেন, “মৃতদের অভিসম্পাত কোনো না এবং জীবিতদের

কষ্টের কারণ হয়ো না।”[১২] আরেক বর্ণনায় আছে, তিনি (ﷺ) বলেন, “...কারণ তারা তাদের প্রতিফল পেয়ে গেছে।”[১৩]

আইশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, নবি (ﷺ) এই হাদিসটি এই উম্মাহর ফিরআউন আবু জাহল সম্পর্কে বলেছেন।

যারা অন্যের দোষ খুঁজে খুঁজে তাকে আক্রমণ করায় ব্যস্ত থাকে, তাদের অন্তর ব্যাধিগ্রস্ত। আগুন যখন পোড়ানোর কিছু পায় না, তখন নিজেকেই পোড়ায়।

অপরকে শুধু ভুলত্রুটির সংকীর্ণ পরিসরে বিচার করা বড় অন্যায়। প্রতিটি ব্যক্তিই বহুমাত্রিক ও জটিল এক সত্তা। প্রত্যেকের মাঝেই এমন কিছু গুণ থাকে, যা ঠিকমতো পরিচর্চা করলে অপরের বহু কল্যাণ সাধন করতে পারে। সংস্কারকদের উচিত মানুষের মাঝে সুপ্ত সেই গুণাবলিকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করা। যথাযথ ও পরিমিত প্রশংসার মাধ্যমেই কেবল তা সম্ভব।

বিভিন্ন ব্যক্তি, গোত্র ও এলাকার ব্যাপারে নবি (ﷺ) যেভাবে প্রশংসা করেছেন, তাতেই এর উদাহরণ পাওয়া যায়। সমাজে কেউ যে সম্মান-মর্যাদার অধিকারী, সেটিকে তিনি আঘাত না করার চেষ্টা করতেন। এ কারণেই মক্কা বিজয়ের দিন তিনি বলেছেন,

مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ

“যে কেউ আবু সুফিয়ানের (এলাকার প্রধান) ঘরে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ।”[১৪]

নবিজি (ﷺ) আরো বলেন,

إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَعَمَطُ النَّاسِ

“অহংকার হলো সত্য প্রত্যাখ্যান করা আর অপরকে তুচ্ছ করা।”[১৫]

নবিজি (ﷺ) এমনই এক নিখাদ ভদ্র মানুষ ছিলেন, যিনি নিজেকে অন্য কারো উপরে প্রাধান্য দিতেন না। তাই তিনি বলেছেন,

[১২] সুনান তিরমিযি: ১৯৮২, মুসনাদ আহমাদ: ১৮১২০

[১৩] সহিহ আল বুখারি: ১৩৯৩

[১৪] সহিহ মুসলিম: ১৭৮০

[১৫] সহিহ মুসলিম: ৯১

هَوْنٌ عَلَيْكَ فَإِنِّي لَسْتُ بِمَمْلُوكٍ إِنَّمَا أَنَا ابْنُ امْرَأَةٍ تَأْكُلُ الْقَدِيدَ

“শান্ত হও। আমি কোনো রাজা-বাদশাহ নই। আমি তো এক নারীর সন্তান, যে শুকনো মাংস আহার করত।”[১৬]

নবিজি (ﷺ) নির্দিধায় সত্য গ্রহণ করে নিতেন, তা যার কাছ থেকেই আসুক না কেন। যেমন কবরের আজাবের ব্যাপারে এক ইয়াহুদির কথাকে তিনি সাথেসাথেই সত্যায়ন করেন।[১৭]

আজকের মুসলিম যুবকদের সত্যিই নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাপদ্ধতি সংশোধন করা উচিত। ভুল চিন্তা থেকে ভুল উপসংহার আসে। তাই বিশেষ কোনো ব্যাপারে ভুল সংশোধন করার চেয়ে এই ধরনের ভুলগুলোর সংশোধন বেশি জরুরি। একটি কারখানার নির্মাণ ও উপাদান সরবরাহেই যদি ভুল হয়, তাহলে উৎপাদনের হার ও মানও খারাপ হবে। সমগ্র কারখানারই সংশোধন দরকার। যখন যেই অংশ সামনে আসে, তখন সেটির মেরামত করতে যাওয়া নিতান্তই বোকামি।

আমার সমালোচকগণ এই প্রবন্ধের একটি বিষয়ে আপত্তি তুলতে পারেন বলে মনে হচ্ছে। তাই আমি এখনই তা স্পষ্ট করে দিচ্ছি। মনে হতে পারে আমি কোনো মানী লোকের মান রক্ষা করার পুরো ধারণাটাই অস্বীকার করছি। না, এমন নয়। আমি মোটেও তা বলতে চাইছি না। আমি বলছি দ্বন্দ্ব-সংঘাত পরিহার করতে, সময় অপচয় না করতে, সংশয় সৃষ্টি না করতে, আমাদের আসল শত্রুদের হাসাহাসি করার সুযোগ না দিতে। কাণ্ডজ্ঞানহীন কাজকর্ম পরিহার করে অধিক উপকারী কাজে ব্যস্ত থাকা উচিত। এমনিতে কারো মান-সম্মান রক্ষার্থে কথা বলতে মুসলিমদের উপর কোন বিধিনিষেধ নেই।

আমি আলোচনা যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত রাখার চেষ্টা করেছি এবং অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা পরিহার করেছি। আশা করি আমি আমাদের চিন্তাপদ্ধতির সংশোধনে কিছুটা হলেও ভূমিকা রাখতে পেরেছি। আমাদের চিন্তাজগতের ‘কারখানা’র মেরামতে কাজ করতে পেরেছি।

[১৬] ইবনু মাজাহ: ৩৩১২

[১৭] সহিহ আল বুখারি: ১৩৭২, সহিহ মুসলিম: ৫৮৬

প্রতিপক্ষ সঠিক হলে সম্ভব থাকুন

ইন্টারনেটে আজকাল আরবি ভাষায় নতুন ধরনের অনেক লেখা দেখা যায়। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও সেগুলোর সম্ভাব্য সমাধান নিয়ে প্রশংসনীয় ও সাহসী লেখালেখি হচ্ছে। এ এক নবযুগের সূচনা। নীরবতার যুগ শেষ হয়ে গেছে। এসেছে অংশগ্রহণ, স্পষ্টবাদিতা ও মুক্ত আলোচনার জামানা।

এই পরিবর্তনকে স্বাগত জানানোর অনেক কারণ রয়েছে। এর মধ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কারণ হলো সমাজের সদস্য হিসেবে প্রত্যেকের নিজের সঠিক ভূমিকা ও দায়িত্ব পালনের ভিত্তি তৈরি হওয়া। এর ফলে সামাজিক স্থিতিশীলতা ও দৃঢ়তা বৃদ্ধি পাবে। অবিচার, বঞ্চনা আর অধিকারহীনতার স্বাভাবিক ফলাফল হলো মনের অস্থিতিশীল দশা।

স্বাধীনতা ও মধ্যমপন্থার আলো-বাতাসেই গড়ে ওঠে পরিমিতবোধসম্পন্ন ও বুদ্ধিমান জনবল। এ কারণেই নবিজি (ﷺ) সবসময় বিনয়ী থাকতেন এবং মানুষকে বকাঝকা ও জোরাজুরি করা থেকে বিরত থাকতেন। দাসের গায়েও কখনও তিনি হাত তোলেননি, একটি বারের জন্যও না। স্ত্রীর গায়ে হাত তোলা তো দূরের কথা। শরিয়তের শাস্তিবিধান ও যুদ্ধের ময়দান ছাড়া কখনও তিনি কাউকে আঘাত করেননি।

নবিজি (ﷺ) গনিমতের মাল বণ্টন করার সময় একবার এক লোক খেঁকিয়ে উঠল, “সুবিচার করুন, মুহাম্মাদ!” তিনি (ﷺ) জবাবে কেবল বললেন, “হায় রে! আমিই যদি সুবিচার না করি তো কে করবে?”

আরেকবার এক লোক বলল, “আল্লাহর কসম! আজকের মাল বণ্টন না ইনসাফের হয়েছে, না আল্লাহর সম্ভটির জন্য।” নবিজি (ﷺ) তা শুনে বললেন, “আল্লাহ তাআলা মূসাকে রহম করুন। তাঁকে এরচেয়েও বেশি যত্নগা সইতে হয়েছে, অথচ তিনি ধৈর্য ধরে ছিলেন।”

রাসূল (ﷺ)-এর প্রতি আল্লাহর নাযিলকৃত এই আয়াতগুলো দেখুন:

(八)

Scanned with CamScanner

عَبَسَ وَتَوَلَّى ﴿١﴾ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ﴿٢﴾

“সে ভ্রু কুঞ্চিত করল এবং মুখ ফিরিয়ে নিল, যখন অন্ধ ব্যক্তিটি তার কাছে এলো।” (সূরাহ আবাসা ৮০:১-২)

এই আয়াতগুলোতে নবিজি (ﷺ) এর প্রতি যথেষ্ট সমালোচনা করা হয়েছে। আয়াতগুলো এমন এক সময় নাজিল হয়েছে, যখন নবিজি (ﷺ)-কে মুনাফিক, শত্রুভাবাপন্ন কাফির ও দুর্বল ঈমানদারদের উপর কাজ করতে হচ্ছিল। তারপরও মানুষকে এই আয়াতগুলো তাঁর তিলাওয়াত করে শোনাতে হয়েছে। কারণ এগুলো তো কুরআনেরই অংশ! এমনকি উম্মাতকে বলতে হয়েছে এই আয়াতগুলি আত্মস্থ করতে এবং সালাতে পাঠ করতে।

নবিজি (ﷺ)-কে দুই রকম অবস্থা থেকে একটি বেছে নেবার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। হয় রাজা-নবি, নয়তো বান্দা-রাসূল। তিনি বান্দা-রাসূল হওয়াকেই বেছে নেন। তিনি বাদশাহর ভাব ধরে থাকতেন না, স্বৈরশাসকের মতো নিজের উপস্থিতি জানান দিতেন না। এক বেদুইন একবার তাঁকে দেখে অস্বস্তিতে কাঁপতে লাগল। নবি (ﷺ) বললেন, “শান্ত হও। আমি তো কেবল এক নারীর সন্তান, যার আহ্ব্য ছিল শুকনো মাংস।”

নবি (ﷺ)-এর একজন শক্তিশালী ও প্রতাপশালী সাহাবি ছিলেন উমর ইবনুল রাদিয়াল্লাহু আনহু। তাঁর খিলাফত আমলে উবাই বিন কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সাথে একটি ইলমি বিষয়ে মতভেদ করেন। উবাই বলেন, “খাতাবের ছেলে! নবিজির সাহাবিগণের কষ্টের কারণ হয়ো না।”

উমর একটুও চটে না গিয়ে বললেন, “ওহ! আমি তাহলে নবিজি (ﷺ)-এর দেওয়া এই তথ্যটি শুনতে পাইনি। আসলে এই ব্যবসা আর হাট-বাজার আমাকে ব্যস্ত করে ফেলেছিল।”

আচরণের এই নম্রতা-ভদ্রতাগুলো আমাদের মাঝে ফিরিয়ে আনতে হবে। আজকের চ্যালেঞ্জিং পৃথিবীতে এর প্রয়োজনীয়তা আরো বেশি।

বর্তমান যুগে একাধিক মত ও পথকে গ্রহণ করার মানসিকতা গড়ে তোলার নানবিধ প্রয়োজনীয়তা আছে। এর মধ্যে অনেকগুলোই ঠিক ইসলামি নিয়মকানুনের সাথে সম্পর্কিত না। যেমন আধুনিক পৃথিবী, মিডিয়া, অর্থনীতি ও রাজনীতি আগের চেয়ে অনেক বেশি উন্মুক্ত। পৃথিবীর শক্তিশালী সব জাতি মিলেও এই গণমুক্তির উত্থান রুখতে পারেনি, সেখানে আপনি-আমি কোন ছার? এ থেকে অনেকের মনে হতে পারে যে, এই পরমতসহিষ্ণুতাও আমাদের উপর চাপিয়ে

দেওয়া একটা জিনিস। বিষয়টাকে আসলে এভাবে দেখা ঠিক নয়। এটি বরং বিরাট এক সুযোগ। স্বীকার করছি যে, মানুষ যেটাতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে সেটা ছেড়ে দেওয়া কঠিন। এর ফলে এমন অনেক বিতর্ক-বিভেদ দেখা দিতে পারে, যার ভয়াবহতা নিয়ে অনেক ইসলামি কর্মীই চিন্তিত। এ কারণেই ইসলামি কর্মীরা অনেক অসুবিধা সত্ত্বেও মতের পার্থক্যকে স্বাগত জানান। এর মাধ্যমেই নবি (ﷺ) ও সাহাবা আজমাইনের সময়কার মতো পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব। ওই সময়টায় ইসলামি কর্মকাণ্ড ইতিহাসের ভারে ন্যুজ হয়ে ছিল না। এভাবেই আদর্শিক ও সামাজিক সংকীর্ণতা কমিয়ে এনে স্বাধীনতার ইসলামি পরিমিতিবোধ অনুসরণ করা সম্ভব।

ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে আজ আমরা যেই স্বাধীনতা লাভ করেছি, অনেকেই তার সদ্যবহার করতে জানে না। আমাদের নিকট অতীত ছিল নতুন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে নতুন নতুন জিনিস শেখার যুগ। ইন্টারনেটভিত্তিক স্বাধীনতা অপব্যবহারকারীদের কুৎসিত ভাষা ও আচরণের ব্যাপারে দুশ্চিন্তা কমানোর জন্য আমাদের এভাবেই পরিস্থিতিকে বোঝা উচিত। অসংখ্য মানুষ কী বলছে, তা না বুঝেই নিজের মত প্রচারে ব্যস্ত। এর অনুশঙ্গ হিসেবে থাকে আলোচনায় অপর পক্ষের অধিকারের প্রতি অসম্মান আর (সত্যিকার বা কাল্পনিক) মতপার্থক্যের প্রতি অসহিষ্ণুতা।

কখনো কখনো মতভেদ সত্যি সত্যিই থাকে এবং সেগুলো হওয়ারই কথা। তাই এসব মতপার্থক্য দেখে আঁতকে উঠার কিছু নেই। কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রতিপক্ষকে বিদ্রোপকারীর মতটিই আসলে ভুল। অথচ সে অজ্ঞতাবশত সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে প্রতিপক্ষকে দোষ দিয়ে চলেছে। আবার কিছু ক্ষেত্রে সত্যিকার কোনো মতপার্থক্য থাকেই না। শব্দের ব্যবহারের ভিন্নতা নিয়েই নিষ্ফল বিতর্ক চলতে থাকে।

তাই আলোচনার ক্ষেত্রে আমাদের আচরণ উন্নত করা এখন দায়িত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে। মতভেদের ক্ষেত্রে কীরূপ ব্যবহার করা হবে, তার নৈতিক মানদণ্ড উঁচু করার সময় এসেছে। এই আচরণবিধির সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা রয়েছে কুরআন ও সুন্নাহতে।

কারো কারো ধারণা আমরা এতই নতুন ধরনের সময়ে বাস করছি যে, পূর্ববর্তী সংকর্মশীল প্রজন্মগুলোর কাউকে অনুসরণ করার কোনো মানেই নেই। এটা একেবারেই ভুল চিন্তা। নবীজি (ﷺ) কখনো দুর্বল, কখনো শক্তিশালী অবস্থানে থেকেছেন। তেমনি মুসলিম উম্মাহও কোনোকালে ক্ষুদ্রসংখ্যক আবার কোনোকালে বিপুল সংখ্যক ছিল। নবীজি (ﷺ) বন্ধুভাবাপন্ন মানুষদের উপরও যেমন কাজ করেছেন, শত্রুভাবাপন্ন মানুষদের উপরও কাজ করেছেন। ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান,

মূর্তিপূজারি সব ধরনের মানুষের সাথেই তাঁর কাজ করতে হয়েছে। মদিনার মুনাফিকদেরও সামলাতে হয়েছে। দুর্বল ঈমানের মুসলিমদের সামলাতে হয়েছে। পরবর্তী যুগগুলোর মতো সে যুগেও মুসলিমদের মাঝে মতপার্থক্য হয়েছে।

আমাদের ঈমানের সাধারণ মূলনীতিগুলোর উপর বেশি জোর দিতে হবে, ব্যক্তিগত মতের বিষয়গুলোতে নয়। কোনোকিছুকে সালফে সালিহীনের অনুসৃত পদ্ধতি বলে দাবি করলে একদম নিশ্চিত হয়ে নিতে হবে যে, সাধারণভাবে এটিই তাঁদের পদ্ধতি। দুই-একজনের বিচ্ছিন্ন মত নয়। সেগুলোও তাঁদের ব্যক্তিগত মত, যা আমরা গণহারে মেনে নিতে বাধ্য নই। আমরা তিনটি জিনিস গ্রহণ করতে বাধ্য:

১। কুরআন

২। সুন্নাহ

৩। সুনিশ্চিত ইজমা (নিছক ইজমার দাবি নয়)

এই তিন উৎসের বাইরে প্রত্যেক যোগ্য আলিম ও বিচারপতির অধিকার রয়েছে ইসলামি শরিয়তের স্পষ্ট দলীল ও মূলনীতির ভিত্তিতে কিয়াস করার।

আলিমগণ একে অপরের মত প্রত্যাখ্যান বা এমনকি খণ্ডন করার ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন। তবে তা করতে হবে যথাযথ পদ্ধতিতে। অভিযোগ ও অপমান না করে। সুন্দর আচরণ হলো সত্যিকারের সত্যানুসন্ধানীর বৈশিষ্ট্য। বক্তব্যের গ্রহণযোগ্যতাও এতে বেড়ে যায়।

মহান কাযি ইমাম আশ-শাফিঈ কিছু প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা বলে গেছেন:

১। আমি বিশ্বাস করি আমার মত সঠিক, তবে তা ভুল হবার সম্ভাবনাও স্বীকার করি।

২। আমি যার সাথেই বিতর্ক করেছি, এই আশায় করেছি যে তার মুখ থেকেই আল্লাহ সত্য কথাটি বের করাবেন।

৩। এক হাজার জ্ঞানীর সাথে বিতর্ক করে আমি জিতে যেতে পারি। কিন্তু একজন মূর্খের সাথে তর্ক করলে আমি নিশ্চিতই হেরে যাব।

৪। কিছু ব্যাপারে মতের মিল না হলেও কি আমরা পরস্পরের ভাই হয়ে থাকতে পারি না?

ইমাম আশ-শাফিঈকে আল্লাহ রহম করুন। মুসলিমদের পারস্পরিক আচার-আচরণ সুন্দর ও যথাযথ করে দিন।

কটাক্ষ করা: একটি আধুনিক কালচার

অনেকের স্বভাবটাই রূঢ় আর ককর্শ। তাদের বিদ্রোহী কথাগুলোতে কোনো শক্তিশালী যুক্তি বা প্রমাণ থাকে না, থাকে শুধু অপমান আর কটাক্ষ।

নবীজি (ﷺ) বলেন,

أَيُّكُونُ اللَّعَّانُونَ شُفَعَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“অভিসম্পাতকারীরা কিয়ামতের দিন সুপারিশকারী হতে পারবে না।”[১৮]

তিনি (ﷺ) আরো বলেন,

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا اللَّعَّانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِيءِ

“মুমিন কখনও গালমন্দকারী বা অভিসম্পাতকারী হতে পারে না। সে নীচ বা অশ্লীল স্বভাবের হয় না।”[১৯]

নবী (ﷺ)-কে যারা ভালোবাসে এবং হাশরের ময়দানে তাঁর সাথে থাকতে চায়, তাদের এই কথাগুলো মেনে চলা উচিত। অর্থাৎ, ভালো কথা ছাড়া একটা শব্দও যেন আমাদের মুখ থেকে বের না হয়। নবীজি (ﷺ)-এর আদেশ,

وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

“...আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি যে ঈমান রাখে, সে যেন ভালো কথা বলে অথবা চুপ থাকে।”[২০]

আল্লাহ সে ব্যক্তির উপর রহম করুন, যে ভালো কথা বলে পুণ্য অর্জন করে অথবা চুপ থেকে নিজেকে নিরাপদ রাখে।

[১৮] সহিহ মুসলিম: ২৫৯৮

[১৯] সুনান তিরমিযি: ১৯৭৭

[২০] সহিহ আল বুখারি: ৬১৩৬

মানুষে মানুষে মতভেদ খারাপ কিছু নয়। বিশেষত এই ফিতনার জামানায়। তবে মতভেদ করার সঠিক পদ্ধতি হলো স্পষ্ট যুক্তি ও শান্ত কথাবার্তা। আমাদের কথা যেন আমাদের অন্তরের পরিশুদ্ধি, মানসিক শক্তি আর চরিত্রের সৌন্দর্যের প্রমাণ বহন করে।

মুসলিম বিশ্ব যে অসংখ্য সমস্যায় জর্জরিত, তা তো দেখতেই পাচ্ছেন। এ যেন ঝড়ের কবলে দৌল্যমান এক জাহাজ, যার যাত্রীরা ডুবে যাবার ভয়ে ভীত। কী দয়ালু, কী শান্ত, কী অস্থিরচিত্ত—সকলের কণ্ঠস্বর একসাথে মিশে গেছে। আর একটি কণ্ঠস্বর আছে, যেটি নিজেকে ছাড়া ডানে-বামে সকলকে গালমন্দ আর অপমান করতে থাকে। নিজেকে সে গালি দেবেই বা কেন? এ তো নিজেকে ভাবে যুগের ত্রাতা, যে মূর্খ-দুর্বল-দুনিয়ালোভীদের শ্রোতের বিপরীতে দাঁড়িয়ে সবকিছু ঠিক করে ফেলবে। বাস্তবতা আসলে বিপরীত। সবচেয়ে খারাপ লোক তো সে-ই, যে শুধু নিজের মধ্যে সব কল্যাণ আর অপরের মধ্যে সব অকল্যাণ দেখে। আমাদের ভাই ও বোনেরা আমাদেরই অংশ। নিজেকে যতটা সম্মান করি, তাঁদেরও ততটুকুই সম্মান দিতে হবে।

আল্লাহ বলেন,

وَلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ

﴿১২﴾

“মুমিন নারী-পুরুষরা যখন তা শুনতে পেল, তখন তারা নিজেদের লোকদের ব্যাপারে সুধারণা কেন করল না?” (সূরাহ আন-নূর ২৪:১২)

আল্লাহ আরো বলেন,

وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِبُغْسٍ الْإِسْمِ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ

لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿১১﴾

“পরস্পরের নিন্দা কোরো না, একে অপরকে খারাপ নামে ডেকো না। ঈমান আনার পর খারাপ কথা বলা কতই না মন্দ! যারা তাওবাহ করে না, তারাই যালিম।” (সূরাহ আল-হুজুরাত ৪৯:১১)

ইন্টারনেট আজ আমাদের দিয়েছে অন্যকে অপমান করার এক অত্যাধুনিক পদ্ধতি—ডিজিটাল অপমান! আজকাল মানুষ তাদের কুৎসা-অপমানগুলো বিনা পয়সায়, বিনা দায়বদ্ধতায়, যাচ্ছেতাই শব্দে, নিজের নাম সহ প্রকাশ করতে পারে।

এসব কাজ যারা করছে, তারা নিজেদের পাপ ফলাও করে দেখিয়ে বেড়াচ্ছে। নবিজি (ﷺ) বলেছেন,

كُلُّ أُمَّتِي مُعَاَفَاةٌ إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ

“আমার সমগ্র উম্মাহকে ক্ষমা করা হবে, শুধু নিজেদের পাপ প্রকাশ করে বেড়ানো ব্যক্তিদের ছাড়া।”[২১]

পরিচয় গোপন রেখে ছদ্মনামে আত্মপ্রকাশ করার সুযোগও করে দিয়েছে ইন্টারনেট। দুর্ভাগ্যবশত যৌক্তিক ও ভারসাম্যপূর্ণ কথাগুলো খুব একটা শ্রোতা টানে না। উল্টোদিকে ডিজিটাল গালিবাজেরা তার সমর্থক ও সমালোচকদের মনোযোগ পেয়ে খুশিতে বাকবাকুম করে। এর কাছে এমনও মনে হতে পারে যে, সে নতুন করে ইতিহাস রচনা করছে!

মোবাইল ফোন হলো এই কাজের আরেক কাজী। এসএমএসের মাধ্যমে জঘন্যতম কথাবার্তাও মুহূর্তেই ছড়িয়ে যায়। এসব কাজ করে অনেকে নিজেকে আবার খুব সাহসী ভাবে। চোর যেমন খুব সাহসিকতার সাথে সিঁধ কাটে, ওরকম সাহসী আরকি। সর্বনাশ হওয়াকে কিছু মানুষ কীভাবে যে এত ভালোবাসে!

নবি (ﷺ) বলেছেন,

“আমার আর আমাদের উম্মাহের উপমা হলো আগুন জ্বালানো এক ব্যক্তির মতো। আগুনে চারপাশ আলোকিত হলে পোকামাকড় এসে আগুনে পড়তে থাকে। সেই ব্যক্তি তাদের দূরে রাখার চেষ্টা করেও সংখ্যাধিক্যের কারণে পেরে ওঠে না। একইভাবে আমিও তোমাদের কাপড় টেনে ধরে আগুন থেকে দূরে সরিচ্ছি। কিন্তু তোমরা আগুনের দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়ছ।” (সহিহ আল-বুখারি এবং সহিহ মুসলিম)

ইলেকট্রনিক মিডিয়ার অপব্যবহার খুবই গর্হিত একটি কাজ। এসব কাজ যারা করে, তারা মূল্যবোধহীন। নীচ লালসা, অন্ধ আক্রোশ আর অযথা বিদ্বেষ তাদের চালিকাশক্তি। যারা মনে করে এ কাজ করে তারা হক আর ঈমানের প্রতিরক্ষা করছে, তারা আরো বড় ধোঁকায় পড়ে আছে।

প্রযুক্তির এই যুগে আজ মানুষ টাকা খরচ করে অপমানিত হচ্ছে। কিছুদিন আগে একটি বিদেশী নম্বর থেকে আমার এক বন্ধুর কাছে এসএমএস আসে, যেন জরুরি

[২১] সহিহ মুসলিম: ২৯৯০

ভিত্তিতে সে কল করে। কল করে সে এক ঘণ্টা যাবত ওপাশ থেকে শুধু গালাগাল শুনল। আমি এ ঘটনা শুনে হাসতে হাসতে বললাম, “পরসা খরচা করে অপমানিত হলে তাহলে!”

কটাক্ষ করার এই কালচারের মাঝে আমরা যারা নিজেদের সিরাতুল মুস্তাকীমে রাখতে চাই, তাদের এই পরামর্শগুলো মেনে চলতে হবে:

১। এ ধরনের আচরণ ও আচরণকারীদের থেকে আমরা মুখ ফিরিয়ে নেব। কুরআন আমাদের ঠিক এটাই বলে:

﴿١٩٩﴾ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“ক্ষমা করতে থাকো, ভালো কাজের আদেশ করতে থাকো; আর অজ্ঞদের এড়িয়ে চলো।” (সূরাহ আল-আ’রাফ ৭:১৯৯)

وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا

تَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ﴿٥٥﴾

“নিরর্থক কথাবার্তা থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলে, ‘আমাদের কাজের ফল আমরা পাব, তোমাদের কাজের ফল তোমরা পাবে; তোমাদের প্রতি সালাম; অজ্ঞদের সাথে আমাদের কোনো লেনাদেনা নেই।’” (সূরাহ আল-কাসাস ২৮:৫৫)

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ

اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾

“নিশ্চয় মুমিনরা সফল হয়ে গেছে, যারা তাদের সালাতে বিনয়-নম্র এবং অসার কথাবার্তায় নির্লিপ্ত।” (সূরাহ আল-মুমিনুন ২৩:১-৩)

নবিজির একটি বৈশিষ্ট্য ছিল অজ্ঞদের কাজকারবারের জবাবে তিনি আরো ভদ্র আচরণ করতেন।

২। আমরা এরচেয়ে উত্তম কিছু দিয়ে জবাব দিতে পারি। অর্থাৎ, আমরা কটাক্ষকারীদের জন্য আল্লাহর কাছে দু’আ করব ও তাদের জন্য ক্ষমা চাইব। বাজে কথার জবাবে সুন্দর কথা বলব। এই আদেশটির কথাও কুরআনে বেশ কয়েকবার এসেছে:

ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ

“মন্দকে প্রতিহত করো উত্তম দিয়ে।” (সূরাহ আল-মুমিনুন ২৩:৯৬)

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا

“আর মানুষের সাথে সদালাপ করবো।” (সূরাহ আল-বাকারাহ ২:৮৩)

أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٥٤﴾

﴿٥٤﴾

“এরা দ্বিগুণ প্রতিদান পাবে। কারণ তারা অবিচল থেকেছে এবং মন্দকে ভালো দিয়ে প্রতিহত করেছে; আর আমি তাদের যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে খরচ করেছে।” (সূরাহ আল-কাসাস ২৮:৫৪)

৩। আমরা ভাবগাম্ভীর্য বজায় রেখে শান্ত থাকব। জীবনের পথ বড় দীর্ঘ। এখানে একটু শান্তি আর বিশ্রাম দরকার। আল্লাহ বলেন,

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ

“তিনিই মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি স্থাপন করেছেন।” (সূরাহ আল-ফাতহ ৪৮:৪)

নবিজি (ﷺ)-এর ব্যাপারে আল্লাহ বলেন,

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ

“তারপর তাঁর প্রতি আল্লাহ নিজের পক্ষ থেকে প্রশান্তি নাযিল করলেন।” (সূরাহ আত-তাওবাহ ৯:২৬)

নবিজি (ﷺ)-কে আল্লাহ বলেন,

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ

﴿١٢٧﴾

“ধৈর্য ধরো, তোমার ধৈর্য তো কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকে। ওদের কার্যকলাপে তুমি দুঃখিত হয়ো না। আর ওদের ষড়যন্ত্রের কারণে অন্তরে কুণ্ঠাবোধ কোরো না।” (সূরাহ আন-নাহল ১৬:১২৭)

সম্ভ্রুটি আর প্রশান্তি নিয়ে বাঁচুন। চাকরি, ব্যবসা, দ্বীনি কার্যক্রম, পড়াশোনা, যেটাতেই আল্লাহর ইচ্ছায় ব্যস্ত আছেন, ব্যস্ত থাকুন। নীরবে, নিষ্ঠার সাথে, ধৈর্য ধরে, খুশি মনে কাজ করুন। মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটায়, এমন মানুষগুলোকে পাত্তা দেবেন না।

৩। তাদের কথার জবাব ও খণ্ডনের পেছনে সময় ব্যয় করব না। এসব কাজের ভার অন্যদের উপর ছেড়ে দিন। আমাদের সব কথাই ঠিক, এমন নয়; অন্যদের সব কথাই ভুল, এমনও নয়। অপমান ও গালাগালি থেকে নিজেদের আগে বাঁচাই।

একজন একবার আমাকে বললেন, “সংবাদপত্রে অমুক যে আপনার ব্যাপারে বাজে কথা লিখল, তার জবাবে কিছু লিখেন না কেন?”

আমি বললাম, “আমার হাতে এর চেয়ে উত্তম কাজ থাকায় আর ওই কাজের পেছনে সময় দিতে চাচ্ছি না। কিন্তু ধরুন আমি তার কথার জবাব দিলাম। তখন সে পাল্টা জবাব দেবে। এরপর কি আমি সব কাজের কাজ ফেলে এই শব্দযুদ্ধে নামব? নাকি একবার জবাব দিয়ে থেমে যাব, যা দেখে মনে হবে প্রতিপক্ষ জিতে গেছে?”

আজ থেকে ত্রিশ, চল্লিশ বা একশ বছর আগে সংঘটিত কলহ-বিবাদের কথা ভাবলাম। শেষমেশ ফলাফল কী হয়েছে? কী পেয়েছে তারা এখান থেকে? এর চেয়ে বেশি স্থায়ী ও যোগ্য কাজের পেছনে আমার সীমিত শক্তি খরচ করা কি বেশি জরুরি নয়?

৫। অন্যের সাথে শত্রুতার কারণে আমরা যেন সত্য অস্বীকার করে না বসি বা ভুলের উপর অটল না থাকি। আত্মসংশোধন আর আত্মশুদ্ধি সবচেয়ে জরুরি।

হ্যাঁ, মানুষ কখনো কখনো আপনার কথার ভুলভাল অর্থ বের করে সমালোচনা করবে। কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে, কারো সমালোচনার কারণে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি আরো গভীর হলো; আপনি আরো ভারসাম্যপূর্ণ সিদ্ধান্তে আসলেন। প্রতিপক্ষ এভাবে আপনার উপকারই করে।

৬। মনে রাখতে হবে যে, আমাদের পাহাড়সম গুনাহ আছে। আমরা হারাম দৃষ্টিপাত করেছি। যা না বলার, তা বলে ফেলেছি। দায়িত্বে অবহেলা করেছি। আল্লাহ দয়া করে আমাদের দুনিয়াতে সহজতর বিপদে ফেলেন, যার মাধ্যমে আমাদের গুনাহ মাফ হয়। আর আখিরাতে আমাদের অবস্থান এত উঁচু হয়, যা কেবল নিজেদের নেক আমলের মাধ্যমে অর্জন করা কখনোই সম্ভব ছিল না।

আল্লাহ আমাদের তাকদীরে লিখে রেখেছেন যে, বাহ্যিকভাবে আমরা প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হবো। কিন্তু তারা আসলে আল্লাহর লুকায়িত নিয়ামত। এর অর্থ এই না যে, তাদের গুনাহর বিনিময়ে আমরা সাওয়াব পাই। আল্লাহ মহান দাতা ও অসীম দয়ালু। তারাও হয়তো তাদের সততা ও নিষ্ঠার কারণে সাওয়াব লাভ করে। আর আমরা আমাদের ধৈর্যের কারণে সাওয়াব লাভ করি। অন্যের ক্ষতি করে নিজের ভালো চাইতে নেই। সবসময় আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। তাহলেই দেখবেন আল্লাহ আপনাকে সব বিপদ-আপদ থেকে মুক্তির পথ খুলে দিচ্ছেন। কল্পনাভীত উৎস থেকে প্রয়োজন মিটিয়ে দিচ্ছেন। আল্লাহ তো ধৈর্যশীলদের সাথেই আছেন।

কথা সত্য, মতলব খারাপ

একটি কনফারেন্সের সভাপতিত্ব করছিলেন এক নারী। সেই কনফারেন্সে অংশগ্রহণকারী এক পুরুষ তাঁর উপর ক্ষেপে গেলেন। বিশেষত নিয়ম-কানুন মানার প্রতি তাঁর দৃঢ়তা দেখে। যেমন বক্তাদের সময় নির্দিষ্ট করা, আসনবিন্যাস, আলোচনার কঠিন জায়গাগুলোর সংক্ষেপে উপসংহার টানা, আর আরবি ভাষায় দক্ষতার “ভান” করা।

সেই পুরুষ বক্তার যখন কথা বলার পালা এলো, তিনি বলে উঠলেন, “যে জাতি নারীকে নেতৃত্বের স্থানে বসায়, তারা সফল হবে না।”

এই হাদিসের বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও এ থেকে প্রাপ্ত বিধিবিধান আলোচনা করা এখানে আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমাদের আলোচ্য হলো এই লোক কীভাবে নবি (ﷺ)-এর একটি কথাকে অপ্রাসঙ্গিকভাবে উদ্ধৃত করে নিজের মনের ঝাল মেটাল। নবিজি (ﷺ)-এর কথা ব্যবহার করে সস্তা ফায়দা নেওয়া কি ঠিক?

আরেকবার টাকা-পয়সা সংক্রান্ত ব্যাপারে এক লোকের সাথে তার প্রতিবেশী আত্মীয়ের মনোমালিন্য হলো। তাঁরা একটা ব্যবসায়িক কারবার শুরু করে লস খেয়েছেন। অনেক আশা-ভরসা ছিল এটা নিয়ে। কিন্তু কিছুই হলো না। উল্টো ঝগড়া লেগে গেল তাদের মাঝে।

কিছুদিন পর একটি পারিবারিক অনুষ্ঠান তাদের আবার কাছে নিয়ে এল। সালাতের সময় হলে ওই দুইজনের একজন এগিয়ে এসে ইমামতি করলেন। অবাক হওয়ার কিছু নেই। ইসলামি পড়াশোনায় তিনি জামিয়া (বিশ্ববিদ্যালয়) থেকে সনদপ্রাপ্ত।

কিন্তু তিনি সালাতে কী তিলাওয়াত করলেন, জানেন? প্রথম রাক’আতে,

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ

الْأَبْصَارُ ﴿٤٢﴾

“অপরাধীরা যা করে, সে ব্যাপারে আল্লাহকে উদাসীন ভেবো না। তিনি তো তাদের সাময়িক অবকাশ দিচ্ছেন সেই দিনের আগ পর্যন্ত, যেদিন চোখগুলো বিস্ফারিত হয়ে যাবে।” (সূরাহ ইবরাহিম ১৪:৪২)

দ্বিতীয় রাক'আতে,

﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ﴾ (১)

“তুমি কি দেখোনি আল্লাহ হাতিওয়ালাদের সাথে কী আচরণ করেছেন?”

(সূরাহ আল-ফীল ১০৫:১)

তিনি কীসের প্রতি ইঙ্গিত করছেন, তা সবাই স্পষ্ট বুঝল। সেসময় আদালতে ওই দুই আত্মীয়ের মাঝে মামলা চলছিল। এমনই এক সময় একজন আরেকজনের দিকে একদম অপ্রাসঙ্গিকভাবে কুরআনের আয়াত ছুঁড়ে মারল।

আল্লাহর কালামকে এভাবে ব্যবহারের অনুমতি তিনি আমাদের দেননি। এগুলো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে, নির্দিষ্ট প্রসঙ্গে নাথিল হয়েছে। আমাদের ব্যক্তিগত ঝগড়াঝাঁটিতে ব্যবহৃত হবার জন্য নয়। অপমান করে প্রতিপক্ষকে ক্ষেপিয়ে তোলার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হবার জন্যে নয়। কুরআন তো বরং মুমিনদের জন্য প্রশান্তি ও আরোগ্য হবার কথা।

এখানেই শেষ নয়। সালাত শেষে মানুষ তখনও উঠে যায়নি। তিনি এই সুযোগে বলতে লাগলেন যে, কীভাবে কিছু মানুষ সালাত আদায় করেও কেবল আল্লাহর কাছ থেকে আরো দূরে সরে যায়। বিশেষত যারা অন্যের টাকা অবৈধভাবে আত্মসাৎ করে... ইত্যাদি... ইত্যাদি... (উল্লেখ্য, এই হাদিসটি সহিহ বলে প্রমাণিত নয়)।

এটি দ্বিনি জ্ঞানের খিয়ানত। আল্লাহ আমাদের যে আয়াত ও হাদিসগুলো শেখার সৌভাগ্য দিয়েছেন, সেগুলো ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহার করাটা দুঃখজনক। পরিস্থিতি আরো খারাপ হয় যখন দ্বিনের ব্যাপারে কম জ্ঞানসম্পন্ন মানুষেরা রাগের মাথায় সেই আয়াত বা হাদিসকেই অস্বীকার করে বসে।

মুশরিকদের ব্যাপারে আল্লাহ আমাদের বলেন,

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

“আল্লাহর পাশাপাশি তারা যেসবের উপাসনা করে, সেগুলোকে গালমন্দ কোরো না। তাহলে তারাও অজ্ঞতাবশত আল্লাহকে গালমন্দ করবো।”
(সূরাহ আল-আন’আম ৬:১০৮)

নিজেদের অন্তর পরিশুদ্ধ রাখতে হলে সবসময় স্মরণে রাখতে হবে যে, আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেওয়া একটি আমানত। মানুষের কাছে আল্লাহ, তাঁর দ্বীন ও তাঁর নবি (ﷺ)-কে প্রিয় করে তুলতে হবে। তার মানে ব্যক্তিগত ঝগড়ায় এই আমানত ব্যবহার করে নিজের পয়েন্ট বাড়ানো যাবে না। ধর্মীয় সত্যকে এই পর্যায়ে নামিয়ে আনা মহা অন্যায়।

আল্লাহ বলেন,

وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ ۚ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴿١١٤﴾

“তোমার প্রতি ওহী সম্পূর্ণ হওয়ার আগে তুমি কুরআনের ব্যাপারে তা আত্মস্থ করার ব্যাপারে তাড়াহুড়া কোরো না। বরং বলো, ‘হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন।’” (সূরাহ তা-হা ২০:১১৪)

দ্বীনের ঢালে স্বার্থ হাসিল

আমি একবার এমনি কথাচ্ছলে একটা ধারণার কথা বললাম। এমনি মাথায় আসা একটি চিন্তা, এ নিয়ে আমি মোটেও নিশ্চিত ছিলাম না। আমার এক সম্মানিত বন্ধু এ কথা শুনে প্রস্তাব দিলেন কুরআন-সুন্নাহ থেকে আমার এই মতের পক্ষে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় কি না, খুঁজে দেখতে। তাহলে মানুষ সহজে মেনে নেবে। কুরআন ও সহিহ হাদিস থেকে স্পষ্ট দলীল থাকলে তা তো নিঃসন্দেহে মুমিনের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ বলেন,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۚ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ﴿٣٦﴾

“আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো ব্যাপারে সিদ্ধান্ত প্রদান করলে কোনো মুমিন পুরুষ বা নারীর জন্য সমীচীন নয় সে ব্যাপারে ভিন্ন সিদ্ধান্ত সন্ধান করা।” (সূরাহ আল-আহযাব ৩৩:৩৬)

কুরআনের কোনো আয়াত বা কোনো হাদিসের অর্থ স্পষ্টভাবে বোঝার পর মুমিনের সামনে কেবল একটিই পথ খোলা থাকে—সে অনুযায়ী কাজ করা। অন্যান্য যুক্তি দিয়ে মতকে আরো শক্তিশালী করা যায় বটে, তবে মুমিনের কাছে কুরআন-হাদিস একেবারে শিরোধার্য। এর বেশি আর কিছুই দরকারই নেই।

আর আয়াত বা হাদিসের অর্থ যদি পুরোপুরি স্পষ্ট না হয়, তাহলে মুমিনের দায়িত্ব সেটির প্রতি ঈমান আনা। নির্দিষ্ট কোনো ব্যাখ্যাকেই সঠিক বলে গোঁয়ারতুমি না করা। প্রখ্যাত ফকিহ ইমাম আশ-শাফিঈ রহিমাহুল্লাহ এই পদ্ধতি অনুসরণ করতেন। তিনি বলতেন, “আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখি। তিনি যা কিছু যে অর্থ বোঝাতে নাযিল করেছেন, সে অর্থের প্রতিই ঈমান রাখি। একইভাবে আমি আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর প্রতি ঈমান রাখি। আর তিনি যা কিছু যে অর্থ বোঝানোর উদ্দেশ্যে বলেছেন, সে অর্থের প্রতি ঈমান রাখি।”

তারপরও কুরআন-সুন্নাহর ব্যাপারে আমাদের পদ্ধতি আর আমাদের সালাফদের পদ্ধতির মাঝে ব্যাপক ফারাক রয়েছে। তাঁরা এগুলোর প্রতি অন্তরের অন্তস্থল থেকে শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। নিজেদের বুঝকে তাঁরা নির্ভুল মনে করতেন না। তাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বাণীর ব্যাখ্যায় নিজেদের মত চাপিয়ে দিতেন না। ফলে বৈধ মতপার্থক্যপূর্ণ ব্যাপারে কুরআন-হাদিসের স্থান ছিল কারো ব্যক্তিগত মতের উর্ধ্বে।

এ ধরনের ব্যাপারে রায় দিতে গিয়ে তাঁরা প্রায়ই বলে দিতেন যে, এটা তাঁর বুঝ অনুযায়ী মত। এর বেশি কিছু নয়। সমালোচক বা প্রতিপক্ষের সাথে বাহাস করার সময় আপন মতের পক্ষে কুরআন ও হাদিসের দলীল তো অবশ্যই ব্যবহার করতেন। তবে ঈমান ও সচেতনতার কারণে পবিত্র কালাম ও নিজেদের মতের মাঝে সুস্পষ্ট পার্থক্যরেখা বজায় রাখতেন।

আলি ইবনু আবি তালিব রাঈয়াল্লাহু আনহু মতকে কেউ কুরআনের মতো নির্ভুল বলে মনে করলে তিনি তাদের কঠোরভাবে তিরস্কার করতেন। কোনটি তাঁর নিজের মত, তা তিনি সতর্কতার সাথে স্পষ্ট করে দিতেন। তাঁর কাছ থেকে শোনা একটি মতের ব্যাপারে কায়স বিন উব্বাদ তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, “এটা কি আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আপনাকে বলেছেন, না আপনার নিজের মত?” আলি নির্দিধায় বললেন, “এ ধরনের কোনো কিছুই আমি আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর মুখে শুনিনি। এটা কেবলই আমার মত।”

মুসলিম উন্মাহর এক টালমাটাল ও সংকটময় সময়ে আলি রাঈয়াল্লাহু আনহু খিলাফতের দায়িত্ব নেন। নিজের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করতে তাঁরই সবচেয়ে বেশি কুরআন-হাদিসের সমর্থন দরকার ছিল। চাইলেই এমনটা করা তাঁর কাছে কোনো ব্যাপারই ছিল না। তিনি কুরআনের একজন মুফাসসির এবং রাসূল (ﷺ)-এর ঘনিষ্ঠতম সহচরদের একজন। তার উপর শাসকের আনুগত্যের ব্যাপারে কুরআন-হাদিসে অজস্র দলীল আছে। প্রতিপক্ষের সাথে মুনাফিকের বৈশিষ্ট্যের মিল দেখাতে চাইলেও সহজেই তা দেখাতে পারতেন।

কিন্তু আলির চারিত্রিক দৃঢ়তা ও নবিজি (ﷺ)-এর প্রতি তাঁর আনুগত্য তাঁকে এমনটা করতে বাধা দেয়। ইসলামের শাস্বত বাণী ঠিকভাবে পৌঁছে দেওয়া মুসলিম হিসেবে তাঁর দায়িত্ব। সর্বোপরি, তিনি ছিলেন তাঁর প্রতিপালকের প্রতি নিষ্ঠাবান। এ কারণেই তিনি স্পষ্টভাবে বলে নিতেন কোনটি তাঁর নিজস্ব মত। পবিত্র কালাম থেকে নিজের মতের পক্ষে দলীল টেনে বের করা থেকে নিজেকে তিনি বিরত রাখতেন।

ঈমানের একদম মৌলিক বিষয়ে কথা বলতে গেলে আমাদের বক্তব্যের পক্ষে কুরআন-সুন্নাহ থেকে বিপুল পরিমাণ স্পষ্ট ও মতভেদহীন দলীল আনা যাবে। কিন্তু শরিয়তের অন্যান্য বেশিরভাগ বিষয়ে যেখানে একাধিক মত আছে, সেখানে এই কথা খাটে না। এখানে একাধিক মতের পক্ষে হয় ভিন্ন ভিন্ন দলীলের সমর্থন পাওয়া যায়, নয়তো একই দলীলের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যার সমর্থন পাওয়া যায়। কোনো একটি বিধান পরে আরেকটি বিধানের মাধ্যমে রহিত হয়ে গেছে কি না, তাও অনেক ক্ষেত্রে অস্পষ্ট থাকে। সাধারণ অনেক বিধান বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। একটি হাদিসের বিশুদ্ধতার মান নিয়েও বহুবিধ মত থাকে।

ফিকহশাস্ত্রবিদদের কাজের সারনির্যাস এগুলোই। তাঁরা এরকম বিভিন্ন শর্ত গবেষণা করে নিজেদের রায় দেন। তাই আমরা দেখি সালাফদের মধ্যকার ফকিহগণ কোনো বিধান আলোচনা করতে গিয়ে ভদ্রতা বজায় রাখতেন। নিজের মতকে যতটা সাবধানতার সাথে পর্যবেক্ষণ করতেন, ভিন্ন মতাবলম্বীর মতকেও ততটাই সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করতেন। প্রতিপক্ষের মতে ভুল পেলে তাঁদের জন্য অজুহাত দাঁড় করাতেন এবং ধরে নিতেন যে, মত ভুল হলেও তাঁদের নিয়ত বিশুদ্ধ ছিল। তিরস্কার করা বা নিজের মত চাপিয়ে দেওয়া থেকে তাঁরা বিরত থাকতেন। শরিয়তের প্রাস্ত আলিম আশ-শিরাজি যথার্থই বলেন, “একজন ফকিহর জ্ঞান যত বেশি হবে, নিজের মতের ব্যাপারে তাঁর সতর্কতা তত বৃদ্ধি পাবে।”

শরিয়তের কোনো বিষয় বা বর্তমানের কোনো ইস্যু আলোচনার সময় আমাদের তড়িৎ উপসংহারে আসা যাবে না। আলোচনা ও নিরপেক্ষ সংলাপের দরজা খোলা রাখতে হবে। কেবলই বিরোধী মতকে খামোশ করিয়ে দেবার কুমতলব নিয়ে কুরআন-সুন্নাহ চষে দলীল বের করা যাবে না।

বেশিরভাগ সময় দেখা যায় যে, নিজের মতের পক্ষে বেশি কঠোর লোকদের বুঝ সবচেয়ে অগভীর হয়। হুটহাট তাঁরা দাবি করে বসেন যে, এই ব্যাপারে ইজমা আছে বা কুরআন থেকে স্পষ্ট দলীল আছে। ভিন্নমতাবলম্বীদের তারাই সবার আগে জাহান্নামি বানিয়ে দেন। তাদের মনে হতে পারে যে, এসব করে তারা পাক কালামের সম্মান করছেন। আমরা দু’আ করি এমনটিই যেন হয় আর আল্লাহ যেন তাদের নিয়ত কবুল করে নেন। একইসাথে তাদের আসল উদ্দেশ্য ও এর কুফলের দিকেও তাদের মনোযোগ ফেরানো জরুরি, যার ব্যাপারে তারা নিজেরাও হয়তো সচেতন নন। কুরআন-সুন্নাহর প্রতি সত্যিকার ভক্তির লক্ষণ হলো সতর্কতা, নম্রতা ও পরমতসহিষ্ণুতা।

চলতি চিন্তাধারা

আমাদের মসজিদে মুয়াজ্জিন সাহেব একবার ইমামতি করলেন। তো তিনি ভুলে পঞ্চম রাক'আতের জন্য দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। কিছুক্ষণ এভাবেই পার হয়ে গেল। তারপর একজন মুসল্লি যথেষ্ট সাহস সঞ্চয় করে বললেন, “সুবহানআল্লাহ!” তার দেখাদেখি বাকি মুসল্লিরাও এ কথা বলতে শুরু করলেন। ইমাম তখন ভুল হয়েছে টের পেয়ে সাহ্ সিজদাহ দিয়ে সালাত শেষ করলেন।

আমি ভাবনায় পড়ে গেলাম। একজন লোক সুবহানআল্লাহ বলার আগ পর্যন্ত বাকিরা চুপ করে ছিলেন কেন? আসলে ইমাম ভুল করেছেন কি না, এ ব্যাপারে তারা শতভাগ নিশ্চিত ছিলেন না। ওই এক ব্যক্তির “সুবহানআল্লাহ” শুনে বাকিরা নিশ্চিত হয়েছেন এবং তার সাথে যোগ দিয়েছেন। এভাবে একজনের কথা বাকিদের সাক্ষ্যের মাধ্যমে সত্যায়িত হলো। অন্যরা না বললে ইমাম হয়তো একজনের “সুবহানআল্লাহ” বলাকে উপেক্ষা করে সাহ্ সিজদাহ না দিয়ে পাঁচ রাক'আতই পড়ে ফেলতেন।

এ ধরনের ভুল শুধু সালাতেই না, বিচার-আচার বা মতামতের ক্ষেত্রেও হতে পারে। ধরুন সমাজে কোনোভাবে একটি ভুল ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। অনেকের মনেই এটার ব্যাপারে সন্দেহ হচ্ছে, কিন্তু ভয়ে কেউ কিছু বলছে না। অনেক বছর পরে কেউ একজন সাহস করে স্পষ্ট দলীল ও যুক্তি দিয়ে ওই ভুল ধারণার বিপক্ষে কথা বলল। এতদিন চুপ করে থাকা মানুষগুলোও সাথে সাথে এসে যোগ দিল। বলল, “বিশ্বাস করুন, আমাদের মনেও অনেকদিন যাবত এই কথাগুলো ঘুরপাক খাচ্ছিল। কিন্তু অন্যদের বিরোধিতার ভয়ে মুখ ফুটে কিছু বলতে পারিনি। আজ আপনার প্রতিবাদ দেখে নিশ্চিত হলাম যে, আমরা ঠিকই ভাবছিলাম।”

আবার কারো কোনো মতামত কালের আবর্তনে হারিয়ে যেতে পারে। সেটির পক্ষে বিশ্বাসযোগ্য যুক্তি-প্রমাণ না পাওয়ায় কেউ হয়তো সেটার কথা তোলেও না। অথবা সত্যি বলতে তারা জানেই না যে, এর পক্ষে যুক্তি-প্রমাণ থাকতে পারে। এ

কারণেই কিছু মতামত বা ধারণা কিছুদিন প্রচারিত হওয়ার পর স্তিমিত হতে হতে একসময় হারিয়ে যায়।

আদর্শের যারা প্রচার করেন তাঁরা নতুন ও কল্যাণকর ধারণাগুলোর স্থায়িত্বের সম্ভাবনা বাড়াতে দুটি কাজ করতে পারেন:

১। কেবল পরিচিত জিনিসেই সন্তুষ্ট হয়ে যাওয়া এবং অপরিচিত জিনিসকে ঘৃণা করার প্রবণতা দূর করতে হবে। এটি অন্যতম একটি নেতৃত্বগুণ। পরিচিতি কখনোই বুদ্ধির জগতে গ্রহণ বা বর্জনের একমাত্র মানদণ্ড হতে পারে না। পরিচিত ও আরামদায়ক জিনিস আঁকড়ে ধরে থাকা যেমন খারাপ, নতুন কিছু একটা পেলেই তা গিলে নেয়াও একইরকম খারাপ। উভয়ক্ষেত্রেই ‘পরিচিত’কে খুব বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। চিন্তাজগতের উপর এর প্রভাবের ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে এবং তা যথাসম্ভব কমিয়ে আনতে হবে।

২। নতুন ধারণা উপস্থাপন করার এবং এর মাধ্যমে প্রগতিশীল ও দৃশ্যমান পরিবর্তন নিয়ে আসার সাহস থাকতে হবে। আদর্শপ্রচারকরা প্রায়ই এত দ্রুত পরিবর্তন আশা করেন, যা একেবারেই অবাস্তব। এছাড়া যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য করে উপস্থাপন করতে না পারলে অচিরেই তা হারিয়ে যাবে। আদর্শের নেতারা যদি সেটির প্রতি যথেষ্ট বিশ্বাসী না হন এবং সেটিকে কাজে অনূদিত করতে না জানেন, তাহলে পরিবর্তন আসবে কী করে? আদর্শ তো তখন চায়ের কাপেই ডুবে মারা যাবে।

রাসূল (ﷺ)-কে আল্লাহ বলেন,

وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلْمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونُ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٣٥﴾ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٣٦﴾

“তাদের প্রত্যাখ্যান যদি আপনাকে ব্যথিত করে, তাহলে জেনে রাখুন। আপনি জমিনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে বা আসমানে আরোহণ করে একটি নিদর্শন নিয়ে এলেও তারা প্রত্যাখ্যানই করত। আল্লাহ চাইলে তাদের সকলকে সুপথে একত্রিত করতেন। অতএব, অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। যারা (সত্যিকার অর্থেই) শ্রবণ করে, নিশ্চিত থাকুন, তারা

গ্রহণ করবে। আর মৃতদের আল্লাহ পুনরুত্থিত করবেন। তারপর তারা তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তিত হবে।” (সূরাহ আল-আন’আম ৬:৩৫-৩৬)

নবি মুহাম্মাদ (ﷺ) আসলেই এক সফল আদর্শপ্রচারকের উদাহরণ। আল্লাহর ইচ্ছায় তিনি মানুষের অন্তর খুলে দিয়েছেন, তাদের অজ্ঞতা দূর করেছেন, এবং ভুল ধারণা সংশোধন করেছেন। প্রচারিত শিক্ষাকে তিনি এক বাস্তবসম্মত জীবনব্যবস্থা হিসেবে তুলে ধরেছেন।

যাহা বলিব, ন্যায় বলিব

ইসলাম আমাদের শেখায় কীভাবে অন্যের ব্যাপারে কথা বলতে হয়। নৈতিক ও ন্যায়পরায়ণ আচরণে কথা বলতে হবে। নিজের ব্যাপারে বা নিকটজনের ব্যাপারে কিছু বলতে হলেও ন্যায়ের সাথে বলতে হবে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ
الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أُولَىٰ بِحِمَا

“হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকো। আল্লাহর ওয়াস্তে ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্য প্রদান করো, যদিও তা তোমাদের নিজেদের বা পিতামাতা বা আত্মীয়ের বিরুদ্ধে হয়। তারা ধনী হোক বা দরিদ্র, আল্লাহই তাদের উত্তম রক্ষাকারী।” (সূরাহ আন-নিসা ৪:১৩৫)

এমনকি যাদের সাথে বিরোধ বা ঘৃণার সম্পর্ক বিদ্যমান, তাদের সাথেও মুসলিমদের ন্যায়সঙ্গত কথা বলতে হবে। আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ
عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا

“হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে অবিচল থাকবে এবং কোনো সম্প্রদায়ের শত্রুতার কারণে কখনো ন্যায়বিচার পরিত্যাগ করো না।” (সূরাহ আল-মায়িদাহ ৫:৮)

এমনকি মুসলিমদের দেশছাড়া করা মুশরিক মক্কাবাসীদের সাথেও আল্লাহ ন্যায়বিচারের হুকুম দিয়েছেন। তিনি বলেন,

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى
الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“যে সম্প্রদায় তোমাদের পবিত্র মসজিদে যেতে বাধা দিয়েছিল, তাদের প্রতি শত্রুতাবশত তোমরা যেন সীমালঙ্ঘন না করে ফেলো। সৎকাজ ও আল্লাহভীতিতে পরস্পরকে সহযোগিতা করো। আর পাপাচার ও সীমালঙ্ঘনে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না। আল্লাহকে ভয় করো। তিনি কঠোর শাস্তিদাতা।” (সূরাহ আল-মায়িদাহ ৫:২)

মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত সম্প্রদায়ের সাথেও ন্যায়ানুগ আচরণ করতে হবে। আল্লাহ মুসলিমদের সীমালঙ্ঘন করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

﴿১৭০﴾

“যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো; কিন্তু সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।” (সূরাহ আল-বাকারাহ ২:১৯০)

নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বাবস্থায় ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা ফরজ করেছেন। অন্যের ব্যাপারে কথা বলাও এর অন্তর্ভুক্ত। নিজের ব্যাপারে হোক বা পরের ব্যাপারে, মুসলিমের ব্যাপারে হোক বা কাফিরের ব্যাপারে, বড় বিষয়ে হোক বা ছোট বিষয়ে, সবসময় ন্যায়সঙ্গত কথা বলতে হবে।

ইবনু তাইমিয়াহ রহিমাহুল্লাহ লিখেছেন, “ন্যায়বিচার সকলের উপর ফরজ। সবার উপর, সর্বাবস্থায়, সকল স্থানে, সকল সময়ে তা প্রযোজ্য। অবিচার সকলের উপর হারাম। কারো উপর, কোনো অবস্থায়, কোনো স্থানে, কোনো কালে অবিচার করা যাবে না।”

কথাবার্তায় ন্যায়ানুগ হওয়ার প্রধানতম একটি মূলনীতি হলো ঢালাও মন্তব্য পরিহার করা। ঢালাও মন্তব্যের ফলে ভেতরকার অনেক ব্যতিক্রম ও মতপার্থক্যকে উপেক্ষা করা হয়। ব্যক্তিগত দায়দায়িত্বের উপর ইসলাম যে পরিমাণ গুরুত্ব দেয়, তার দাবি হলো প্রত্যেকে নিজ নিজ মত, কথা ও কাজের ব্যাপারে নিজেই সরাসরি দায়ী। একই বর্ণের বা একই সম্প্রদায়ের অন্য কারো কথা বা কাজের জন্য সে নিজে দায়ী হবে না। আল্লাহর কাছেও দায়ী হবে না, মানুষের কাছেও না।

আল্লাহ বলেন,

وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ﴿١٣﴾

“আর আমি প্রত্যেকের আমলনামা তার তার ঘাড়ে সংযুক্ত করে দিয়েছি। আর কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য বের করে আনব উন্মুক্ত এক কিতাব।” (সূরাহ আল-ইসরা ১৭:১৩)

كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ

“প্রত্যকে নিজ নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী।” (সূরাহ আত-তুর ৫২:২১)

আল্লাহ আমাদের হুকুম করেছেন সবার সাথে সদাচরণ করতে, কারণ তা ন্যায়বিচার বাস্তবায়নের অধিক নি কটবতী।

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا

“আর মানুষকে উত্তম কথা বলো।” (সূরাহ আল-বাকারাহ ২:৮৩)

অন্যদের সত্যের দিকে আহ্বান জানানোর সময়ও দয়ালু আচরণ করতে হবে:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٢٥﴾

“তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান করো হিকমাত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে বিতর্ক করো সর্বোত্তম পন্থায়। তোমার প্রতিপালক ভালো করেই জানেন কে তাঁর পথ ছেড়ে বিপথগামী এবং কে সুপথে আছে।” (সূরাহ আন-নাহল ১৬:১২৫)

মুসলিমদের চিন্তাচেতনায় এর এক ইতিবাচক প্রভাব পড়ার কথা, যার ফলে তারা সর্বদা ন্যায় ও সাম্যের ভিত্তিতে আচরণ করবে। মুসলিম অপরের প্রতি দয়ালু হবে। রাসূল প্রেরণের অন্যতম একটি উদ্দেশ্য হলো সকলের প্রতি দয়া। আল্লাহ বলেন,

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

“আমি তো আপনাকে সমগ্র জগতের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি।”

(সূরাহ আল-আশ্বিয়া ২১:১০৭)

দয়া এক মহৎ গুণ। এটি আল্লাহর রাসূলগণের এবং তাঁদের সত্যিকার অনুসারীদের বৈশিষ্ট্য। সুন্নাহর প্রকৃত অনুসারীদের আচরণ সবসময় দয়াপূর্ণ হয়। আল্লাহর নূর ও হিদায়াতের সাথে নৈকট্য যত বাড়বে, সিরাতুল মুস্তাকীমে দৃঢ়তা যত বেশি হবে, ততই মুসলিমের আচরণ দয়ায় ভরপুর হবে।

প্রতিদিন আমরা আল্লাহর কাছে এই বলে দু'আ করি,

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٣﴾ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٤﴾

“পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু। বিচারদিবসের অধিপতি। আমরা শুধুই আপনার দাসত্ব করি এবং আপনারই কাছে সাহায্যপ্রার্থনা করি। আমাদের সরলপথে চালিত করুন।” (সূরাহ আল-ফাতিহা ১:২-৪)

মানুষকে কথা দিয়ে আক্রমণ করা বা অপবাদ দেওয়া কখনোই উচিত নয়। কারো ব্যাপারে মন্দ ধারণা করা ন্যায়বিচারের প্রধানতম একটি অন্তরায়।

আল্লাহ বলেন,

إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ ۖ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ رَبِّهِمْ الْهُدَىٰ

“তারা কেবল অনুমানের অনুসরণ করে। সত্যের বিপরীতে ধারণা-অনুমান কোনো কাজে আসে না।” (সূরাহ আন-নাজম ৫৩:২৩)

কেবলই সন্দেহের ভিত্তিতে কিছু করা ঠিক নয়। আল্লাহ এই সমস্যার কথা তুলে ধরে বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَحْسَسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

“হে বিশ্বাসীগণ! অত্যধিক ধারণা করা ত্যাগ করো। নিশ্চয় কিছু কিছু ধারণা পাপ। পরস্পরের পেছনে গোয়েন্দাগিরি কোরো না। আর একে অপরের গীবাত কোরো না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের মাংস খেতে পছন্দ করবে? বরং তোমরা তা প্রচণ্ড ঘৃণা করে থাকো। আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ অতিশয় তাওবাহ কবুলকারী, পরম দয়ালু।” (সূরাহ আল-হুজুরাত ৪৯:১২)

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একে অপরের ব্যাপারে অন্যায় কথাগুলো তৈরি হয় অহেতুক সন্দেহ থেকে। এসব অভিযোগ তারা প্রমাণ করতে পারবে না।

ভিন্নমতাবলম্বীদের সাথেও ন্যায়বিচার করা আবশ্যিক। ইবনু তাইমিয়াহ রহিমাহুল্লাহ বলেন, “বিদআতি ও পাপাচারীকে দয়া ও নম্রতার সাথে সংশোধন করতে হবে, রাগ বা প্রতিহিংসার ঝোঁকে নয়।” [২২]

ইসলামের সার্বিক নৈতিক শিক্ষার দাবি হলো ন্যায়পরায়ণ ও দয়ালু আচরণ। এই শিক্ষাগুলো কুরআন-হাদিসের স্পষ্ট দলীল থেকে প্রমাণিত। এমনকি শত্রুর সাথে আচরণের সাধারণ মূলনীতিও ভদ্রতা। এর ফলে শত্রুতা হ্রাস পায় এবং সম্প্রীতি ও সমাধানের দ্বার উন্মোচিত হয়। আল্লাহ বলেন,

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ
عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴿٣٤﴾ وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا ذُو
حِزْبٍ عَظِيمٍ ﴿٣٥﴾

“ভালো ও মন্দ সমান নয়। মন্দকে প্রতিহত করো উত্তম দিয়ে। তাহলে দেখবে তোমার সাথে যার শত্রুতা রয়েছে, সে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যাবে। ধৈর্যশীল ও আত্মসংযমী ছাড়া আর কেউই এই কল্যাণের অধিকারী হতে পারে না। আর তারাই মহাভাগ্যবান।” (সূরাহ ফুসসিলাত ৪১:৩৪-৩৫)

গালমন্দ, অপমান ও দোষত্রুটি বড় করে দেখানোর মাধ্যমে শত্রুতা লাগানো কঠিনতম অবিচার। আর সত্যের চাদর দিয়ে নিজের অবিচার ঢাকতে চাওয়া তো আরো বড় অন্যায়। কুরআনের বাণী, ইসলামের শিক্ষা আর আলিমদের উক্তিকে নিজের ঘৃণা উদগীরণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা কতই না হীন আচরণ! মতভেদকে ছুতো বানিয়ে জুলুম উস্কে দেওয়ার ব্যাপারে মুসলিমদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ
بِالْحَقِّ لِيُخْخِمْ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۚ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ

بَعْدَ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَعِيًّا بَيْنَهُمْ ۖ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢١٣﴾

“মানবজাতি একই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। অতঃপর আল্লাহ সুসংবাদবাহক ও ভয়প্রদর্শকরূপে নবিগণকে প্রেরণ করলেন এবং তিনি তাদের সাথে সত্যসহ গ্রন্থ অবতীর্ণ করলেন, যেন (ঐ কিতাব) তাদের মতভেদের বিষয়গুলি সম্বন্ধে মীমাংসা করে দেয়। অথচ যারা কিতাবপ্রাপ্ত হয়েছিল, স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ তাদের নিকট সমাগত হওয়ার পরও পরস্পরের প্রতি হিংসা বিদ্বেষ বশতঃ তারা সেই কিতাব নিয়ে মতভেদ ঘটিয়ে বসল। বিশ্বাস স্থাপনকারীরা যে বিষয়ে মতভেদ করত, আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে সেই বিষয়ে তাদেরকে সত্য পথে পরিচালিত করেন। আল্লাহর যাকে ইচ্ছা সঠিক পথে পরিচালিত করেন।” (সূরাহ আল-বাকারাহ ২:২১৩)

দয়ার নীতি থেকে বিচ্যুত হলে মানুষ জুলুম-অবিচারের দিকে হেলে পড়ে। মতভেদের ব্যাপারে ইসলামি আচরণবিধি ভুলে গিয়ে তারা পরস্পরের অধিকারের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করে। অথচ এসব অধিকার সংরক্ষণের জন্য আল্লাহ তাঁর কিতাবে আদেশ করেছেন।

এ ব্যাপারে অসাধারণ একটি উপদেশ ও নসীহাহ রয়েছে এই আয়াতে,

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۚ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

“আর ইয়াতিমরা বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুদ্দেশ্য ব্যতীত তাদের বিষয় সম্পত্তির কাছেও যেয়ো না। আর লেন্দেন, পরিমাণ-ওজন সঠিকভাবে করবে। আমি কারও উপর তার সাধ্যাতীত দায়িত্ব অর্পণ করি না। আর তোমরা যখন কথা বলবে, তখন স্বজনের বিরুদ্ধে হলেও ন্যায্যানুগ কথা বলবে। আর আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূরণ করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে এসব বিষয় নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা তাঁর এ নির্দেশ ও উপদেশ গ্রহণ কর।” (সূরাহ আল-আন’আম ৬:১৫২)

সমালোচনা ও সৌজন্য

সমালোচনা ও সংলাপের একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি নিয়ে এখানে আলোচনা করতে চাই। মানবজাতির মৌলিক গঠন একইরকম। প্রত্যেকেই তার আবেগ, বোঁক, চিন্তা ও স্বার্থ দিয়ে প্রভাবিত। প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু গুণ ও দোষ আছে। সংলাপ হোক বা সংঘাত, একাধিক মানুষের মাঝে মিথস্ক্রিয়া হলেই এই বিষয়গুলো সামনে চলে আসে।

সমালোচনার অনেকগুলো মূলনীতি নিয়ে আলাপ করা যায়। তবে সবগুলোর সারকথা দুটি—সৌজন্য ও জ্ঞান। জ্ঞানের কথা আগে উল্লেখ করলেই মনে হয় বেশি ভালো দেখাত। জ্ঞানই যদি না থাকল তো বিতর্কের মূল্য আর রইল কোথায়? আমাদের অধিকাংশের নজর এড়িয়ে গেলেও এখানে মূল প্রভাবক আসলে সৌজন্য। সমালোচনা ও সংলাপ—উভয় ক্ষেত্রে সৌজন্যের অবস্থান ভালো করে বোঝা দরকার।

সমালোচনা বা সংলাপ যদি সৌজন্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়, তাহলে অন্যায় ও সংঘাতের দুয়ার খুলে যায়। সত্য, ঈমান আর ন্যায়ের প্রতিরক্ষার নাম করে মানুষ তখন অনৈতিক আচরণে লিপ্ত হয়ে পড়ে। পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবধারীদের অনেকেই ঠিক এখানটায় এসে ভুল করেছে। এজন্যই আল্লাহ কুরআনে আমাদের বলেন,

أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

“তোমরা দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করো এবং তাতে বিভক্তি সৃষ্টি কোরো না।”

(সূরাহ আশ-শূরা ৪২:১৩)

মানুষের মাঝে বিভক্তি না এনে যারা সত্য তুলে ধরতে পারে না, তারা আসলে ইসলামকে ভালো করে বুঝেই উঠেনি। একই কথা তাদের ব্যাপারেও প্রযোজ্য, যারা মিথ্যে না বলে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে না।

দ্বীনের জরুরি বিষয়গুলো সুরক্ষার আবশ্যিকতা নিয়ে অনেককেই কথা বলতে শুন। তাদের কথা ঠিকই আছে। তবে সৌজন্য ও সুন্দর আচরণ এই জরুরি বিষয়গুলোরই অন্তর্ভুক্ত। পুরো আলোচনাই শুরু হওয়া উচিত সৌজন্য সুরক্ষার গুরুত্ব নিয়ে। মুসলিম উম্মাহর মাঝে আজ জ্ঞানের অভাব মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়েছে, সন্দেহ নেই। তবে একই সমস্যা ঘটেছে সামাজিক আচরণ, স্বভাবজাত সৌজন্য ও সদাচারের ক্ষেত্রেও। দ্বীনের দাঈ আর সমাজসংস্কারকদের প্রাথমিক আলোচ্য হওয়া উচিত এই মৌলিক নৈতিক মূল্যবোধগুলোর ব্যাপারে মানুষের অজ্ঞতা। সত্যি বলতে সঠিক মূল্যবোধ আর সৌজন্যের ফলাফল হলো সুষ্ঠু জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, উল্টোটাই নয়।

সামাজিক অবক্ষয়ের লক্ষণ হলো স্বাভাবিক সৌজন্য ও নৈতিক আচরণের ব্যাপারে অসচেতনতা। যে গুণের কারণে আল্লাহ আমাদেরকে বাকি সৃষ্টিজগতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন, সেটিই আজ দূষিত হয়ে গেল। ফলে মানুষ হয়ে গেল নিকৃষ্টের চেয়েও নিকৃষ্ট। ইতিহাসজুড়ে সভ্যতার উত্থান-পতন এই বাস্তবতারই সাক্ষ্য দেয়। এই নৈতিক মূল্যবোধগুলো সংস্কৃতিভেদে পরিবর্তনশীল কোনো প্রথা নয়, বরং একইসাথে চিরন্তন মানবীয় দৃষ্টিভঙ্গি এবং আসমানী হুকুম। এজন্যই নবি করীম (ﷺ) বলেন, “আমাকে সুন্দর আচরণের পূর্ণতা প্রদান করতেই পাঠানো হয়েছে।” [২৩] সকলের মাঝে সুপ্ত সর্বজনীন মানবীয় গুণাবলি জাগিয়ে তুলতেই তিনি প্রেরিত হয়েছেন। আমরা মুসলিমরা একে ঐশী আদেশ হিসেবে দেখে থাকি। তবে সেইসাথে এটি সমগ্র মানবজাতির ফিতরাত বা স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যও বটে। অন্যান্য সংস্কৃতিতে হয়তো এই মূল্যবোধগুলোকে সেকুলার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়, তবে এগুলোর অস্তিত্ব অনস্বীকার্য।

যা-ই হোক, এই মূল্যবোধগুলোর ব্যাপারে কুরআনে ঐশী হুকুম আসার অর্থ সেগুলোর বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করা। কারণ মানুষের পরিবর্তনশীল দৃষ্টিভঙ্গিতে কখনো কখনো ভালো হয়ে যায় খারাপ, খারাপ হয়ে যায় ভালো। এজন্যই আইশা রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসূল (ﷺ)-এর বর্ণনায় বলেছেন,

فَإِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ الْقُرْآنَ

“আল্লাহর রাসূলের চরিত্র ছিল কুরআন।” [২৪]

[২৩] মুসনাদ আহমাদ: ৮৫৯৫

[২৪] সহিহ মুসলিম: ৭৪৬

সমালোচনার প্রসঙ্গে ফেরত যাই। বলছিলাম এর জন্য প্রথম ও প্রধান মূলনীতি সৌজন্য ও সদাচরণ। বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির পুনঃযাচাই, সংশোধন, বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনা ও খণ্ডন আমাদের সামাজিক জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রতিটি যুগের মুসলিম আলিমগণ এই কাজ কখনো না কখনো করেছেন। মুসলিমরা বুদ্ধিবৃত্তির যত শাখায় হাত দিয়েছে, প্রতিটিতেই খণ্ডন, সমালোচনা ও পুনঃযাচাই সংক্রান্ত বই রয়েছে। কিছু বইয়ের বিষয়বস্তু নির্দিষ্ট কোনো ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন। ইমাম বুখারি এবং আহমাদ বিন হাম্বলের মতো প্রখ্যাত আলিমদেরও এ ধরনের কাজ রয়েছে।

সমালোচনার ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গির সারসংক্ষেপ হিসেবে মালিকি মাজহাবের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম মালিক বিন আনাস বলেন, “কবরে শায়িত ব্যক্তি (ﷺ) ছাড়া আর কারো মতামতই সমালোচনার উর্ধ্বে নয়।” কবরে শায়িত ব্যক্তি মানে এখানে মুহাম্মাদ (ﷺ)। আল্লাহর পক্ষ থেকে সরাসরি ওহী লাভকারী রাসূল (ﷺ) ছাড়া বাকি সবার মতেরই সমালোচনা হওয়া সম্ভব।

বুদ্ধিবৃত্তিক পর্যায়ে প্রমাণ, যথার্থ যুক্তি ও স্পষ্ট পদ্ধতিভিত্তিক সমালোচনা খুবই প্রশংসনীয় ব্যাপার। আবোলতাবোল পদ্ধতির বদলে এরকম সমালোচনা সমাজে প্রভূত কল্যাণ বয়ে আনে। সকলেই এটি স্বীকার করে। তবে এই সিদ্ধান্তের একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুসিদ্ধান্ত আছে। তা হলো আমাদের প্রত্যেকের মতামতই সমালোচনার অধীন। যে কারো মতকে অন্য কেউ সমালোচনা করতে পারে। কেউই সবসময় সঠিক নয়।

আমাদের দ্বীনে কিছু মৌলিক ও বিশ্বজনীন সত্য আছে, যেগুলোকে আমরা কখনওই প্রশ্ন করব না। যেমন- ঈমানের মৌলিক বিষয়গুলো এবং মুসলিমদের ঐক্যমত্যের বিষয়গুলো। তবে সতর্ক থাকতে হবে যে, কিছু মানুষ নিজেদের মতকে সমালোচনার উর্ধ্বে রাখার জন্য সেগুলোকে ঈমানের মৌলিক বিষয়ের সমপর্যায়ের হিসেবে তুলে ধরে।

ইসলামের মহান আলিমদের কর্মপদ্ধতি এমন ছিল না। তাঁরা অন্যদের মতের সমালোচনা যেমন করতেন, নিজেদের মতও পুনঃযাচাই করতেন। সমালোচনাকে তাঁরা সাদরে গ্রহণ করতেন। যেমন- ইমাম মালিকের সমালোচনা করেছিলেন তাঁর সহকর্মী ফকিহ লাইস বিন সা'দ এবং মুহাম্মাদ আশ-শাইবানি। এই দুজনই ফিকহি পদ্ধতির উপর সমালোচনামূলক লেখালেখি করেছেন। ইমাম আবু হানিফার অনেক ফাতওয়ার সমালোচনা করেছেন ইমাম আশ-শাফিঈ। কিন্তু তাঁরা সকলেই একে অপরের প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান বজায় রাখতেন। তাঁরা সম্মান ও ভদ্রতা সহকারে নিজেদের মত তুলে ধরতেন, পাণ্ডিত্যের মান কঠোরভাবে বজায় রাখতেন।

আমাদের উচিত তাঁদের অনুসরণ করা এবং মেনে নেয়া যে, আমাদের কথা বা লেখা অপরের সমালোচনার অধীন। মুখে নিজেকে সমালোচনা গ্রহণে প্রস্তুত বলে দাবি করা তো সহজ। কিন্তু সত্যিকার অর্থেই অন্তরে সেই প্রস্তুতি তৈরি করা কঠিন।

আজকের যুগে মুসলিমরা সহজেই বিভিন্ন আধুনিক মাধ্যম ব্যবহার করে আলিম, দাঈ ও সমাজসংস্কারকদের মত জানতে পারেন। এই সব তথ্য সঠিকভাবে প্রক্রিয়াজাত করার জন্য প্রয়োজনীয় পর্যালোচনামূলক চিন্তার দক্ষতা গড়ে তোলা উচিত। মতভেদ যখন যথারীতি চলেই আসে, তখন কেবল উক্তি আর মতামত উদ্ধৃত করতে পারাই যথেষ্ট নয়। চারিদিকে এত মতভেদ কেন, এ নিয়ে অনেকেই আজকাল মাতম করেন। সর্বজনগ্রাহ্য একটি ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি তুলে আনার দাবি করেন। এটি আরেকটি গভীর সমস্যার ইঙ্গিত দেয়। মানুষ ভাবতে শুরু করেছে যে, সমাজে বিভিন্ন মত থাকলে ইসলামি সৌহার্দ্য বজায় রাখা অসম্ভব। তারা মনে করছে সব মতভেদ দূর করতে পারলেই কেবল ভ্রাতৃত্ব, ন্যায়বিচার ও সামাজিক স্থিতিশীলতা অর্জিত হবে।

ইসলামের বেশিরভাগ মতভেদগুলো ইজতিহাদি পর্যায়ের, অর্থাৎ মানবীয় সিদ্ধান্তভিত্তিক। প্রথম কথা হলো এটা কোনো সমস্যাই নয়। বরং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই মতভেদগুলো সমাজকে সমৃদ্ধ করে এবং প্রয়োজনীয় সহজতা আনয়ন করে। পরিবেশ, সংস্কৃতি, এমনকি ব্যক্তির অবস্থাভেদে বিভিন্নরকম সমাধানের পথ খুলে দেয়। আজকের যুগের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমাদের এরকম প্রশস্ত দৃষ্টিভঙ্গি দরকার, যার মাধ্যমে আমরা ইসলামের মৌলিকত্ব রক্ষা করেই বিভিন্ন পরিস্থিতির জন্য বিভিন্নরকম সমাধান বের করতে পারব।

আমরা যদি মুসলিমদের মাঝে ঐক্যের চেতনা সত্যিই রক্ষা করতে চাই, তাহলে অন্যের মতের প্রতি সম্মান এবং নিজের মতের সমালোচনার প্রতি উদার মানসিকতা গড়ে তোলা উচিত। এই সংস্কৃতি আমাদের নিজেদেরও লালন করতে হবে, সন্তানদেরও শিক্ষা দিতে হবে। রাসূল (ﷺ) বলেন, “প্রত্যেক আদমসন্তানই ভুল করে।” [২৫]

মুসলিম হিসেবে আমাদের বুঝতে হবে যে, দীন আমাদের কারো কথামতো চলবে না এবং আমরা কেউই ভুলের ঊর্ধ্বে নই। মহান সাহাবি এবং ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

[২৫] সুনান তিরমিযি: ২৪৯৯, ইবনু মাজাহ: ৪২৫১

আমি একটি বিষয় নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। এমন সময় আমার স্ত্রী এসে বললেন, “আপনি এমন এমন করলেই তো হয়...”

আমি তাঁকে বললাম, “তোমার এত মাথাব্যথা কিসের? আমার ভাবনা আমাকে ভাবতে দাও।”

তিনি জবাব দিলেন, “বা রে! আপনার মেয়ে রাসূল (ﷺ)-এর সাথে দ্বিমত করতে পারে, আর আমি আপনার সাথে দ্বিমত করতে পারব না?” [২৬]

রাসূল (ﷺ) আসলেই সমালোচনার প্রতি খোলামন ছিলেন। দুনিয়াবি বিষয়ে নবিজির মতের ব্যাপারে সাহাবিগণ প্রায়ই ভিন্নমত দিতেন। তবে দ্বীনের ব্যাপারে তিনি যা বলতেন, তা অবশ্যই প্রশ্রীত ওয়াহী। এ ব্যাপারেই আল্লাহ বলেন,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۚ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ﴿٣٦﴾

“আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো ব্যাপারে সিদ্ধান্ত প্রদান করলে কোনো মুমিন পুরুষ বা নারীর জন্য সমীচীন নয় সে ব্যাপারে ভিন্ন সিদ্ধান্ত সন্ধান করা।” (সূরাহ আল-আহযাব ৩৩:৩৬)

তবে তাঁর ব্যক্তিগত মত ও ইচ্ছার কথা একেবারেই আলাদা। এসব ব্যাপারে তিনি শিশুদের ভিন্নমতও শুনতেন। যেমন- আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর বাল্যকালের একটি ঘটনা বলেন,

একবার আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আমাকে কোনো একটা কাজে কোথাও যেতে বললেন। আমি বললাম, “যাব না।” মদিনার এক ছেলেকে আমি কথা দিয়েছিলাম যে, ওইদিন তার সাথে খেলতে যাব। আমি ওখানেই চলে গেলাম। অনেকক্ষণ পর। তখনও আমি দুটো ছেলের সাথে খেলাধুলা করছিলাম। নবি (ﷺ) এসে বললেন, “উনাইস (ছোট আনাস)! এবার আমার ওই কাজটা করে দাও।” [২৭]

ইসলাম আমাদের কাছে এমনই নম্র ও সৌজন্যমূলক আচরণ চায়।

[২৬] সহিহ আল বুখারি: ৪৯১৩, সহিহ মুসলিম: ১৪৭৯

[২৭] সহিহ মুসলিম: ২৩১০, আবু দাউদ: ৪৭৭৩

সমালোচনা ও আত্মজিজ্ঞাসা

অন্য কেউ সমালোচনা করার আগে নিজেই নিজের মতকে পর্যালোচনা ও পুনর্মূল্যায়ন করা সততা ও চারিত্রিক সৌন্দর্যের লক্ষণ।

অন্যের মতের সমালোচনা করতে, এমনকি খণ্ডন করে বই লিখতে অনেকেই সদাতৎপর। কিন্তু একই কাজ তাদের ব্যাপারে অন্যেরা করলে তাঁরা আবার রক্ষণাত্মক হয়ে ওঠেন। বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে সজ্জিত বর্তমান পৃথিবীতে এ ধরনের আবরণ সদিচ্ছার অভাবকেই ইঙ্গিত করে।

আমাদের সালাফগণ প্রায়ই নিজেদের মত প্রত্যাহার করতেন। উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার উত্তরাধিকার সংক্রান্ত এক মামলায় এক ধরনের রায় দিলেন। পরে একই ধরনের আরেক মামলায় ভিন্নরকম রায় দিলেন। লোকে এ নিয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, “আগে আমি বিষয়টাকে ওভাবে দেখতাম। এখন এভাবে দেখি।” [২৮]

ইতিহাসে অসংখ্যবার প্রখ্যাত ফকিহ ও মুহাদ্দিসগণ কোনো না কোনো ফাতওয়া বা হাদিসের ব্যাখ্যার ব্যাপারে নিজেদের মত পরিবর্তন করেছেন। মহান অনেক নেতা তাঁদের সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ অনেক বিষয়ে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করেছেন। তাহলে আজকে আমাদের আত্মসমালোচনা করতে সমস্যা কোথায়? অন্যের সমালোচনায় আজকে আমরা এত করিৎকর্মা কেন? ঈমানের প্রতিরক্ষার স্বার্থে অপরের সংশোধন যদি এতই জরুরি হয়ে থাকে, নিজের সংশোধন তো এর চেয়েও জরুরি হবার কথা।

নিজেদের দিকে তাকালে দেখতে পাব নির্দিষ্ট কিছু মতের দিকে ঝোঁক আমাদের নিরপেক্ষ বিচারক্ষমতাকে প্রভাবিত করছে। যেমন- পরিবর্তনের প্রতি অনীহা, যেমন আছে তেমনই থাকার প্রবণতা। যুগের ট্রেন্ড, বেড়ে ওঠার পরিবেশ, নির্দিষ্ট কারো সাথে ঘনিষ্ঠতা সবকিছুই আমাদের সিদ্ধান্তে প্রভাব ফেলে। এসব প্রভাব

আমাদের অজান্তেও পড়তে পারে। আমরা কোন জিনিসগুলো পর্যালোচনা ও যাচাই করে নেব আর কোনগুলো বিনাবাক্যব্যয়ে মেনে নেব, তাও এ বিষয়গুলো দিয়ে নির্ধারিত হয়। শুধুমাত্র বক্তার ভিত্তিতেই সবসময় বক্তব্যের সত্য বা মিথ্যা নির্ধারিত হয় না। কোনো কোনো বিষয়ের আবার বিভিন্ন মাত্রার সুবিধা-অসুবিধা থাকে, একেকজন একেক বিষয়ে পারদর্শী হয়। আমরা বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে এগুলো বুঝতে পারি, তারপরও আমাদের মনের ঝোঁক আমাদের চিন্তাকে প্রভাবিত করতে পারে।

সংকীর্ণমনস্কতা আর দলাদলতার মৌখিক নিন্দা করা তাই সহজ বটে। কিন্তু অবচেতনভাবেই আমরা সবচেয়ে নিকৃষ্ট দলাদলতার ভেতর পড়ে যাই। সেটা হলো নিজ মতের প্রতি অন্ধ আনুগত্য। একই কারণে অন্যদের মতকে এত সহজে সমালোচনা করা যায়।

আমাদের মানবীয় পরিবর্তনশীলতার কথা মাথায় রেখেই অন্যের সমালোচনার ব্যাপারে আরো সতর্ক হওয়া উচিত। অন্যের মত পর্যালোচনা না করে ব্যক্তিকে আক্রমণ করার ব্যাপারে আমাদের সাবধান হতে হবে।

অতীতে আমাদের সালাফরা পর্যালোচনামূলক যেসব লেখা লিখেছেন, সেখানে এই মূলনীতির বাস্তব প্রয়োগ আমরা দেখতে পাই। তাঁরা আলাদা বই লিখে অন্য কারো বইয়ের খণ্ডন করতেন। একটি মত উপস্থাপন ও ব্যাখ্যা করে তাঁরা অন্য আরেকটি মতের খণ্ডন করতেন। শুধুই অন্যের ভুলের তালিকা বানানোর অভ্যাস সালাফদের মাঝে আমরা দেখি না। ভিন্নমতাবলম্বীর ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে পড়ে না থেকে তাঁরা মূল বিষয়ে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখতেন।

সমালোচনার সময় মনে রাখতে হবে যে, আমাদের এই সমালোচনাও সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। তাহলে আমাদের কণ্ঠস্বর ভদ্রস্থ হবে। সমালোচনা একটি ব্যক্তিগত চ্যালেঞ্জ, কারণ আমরা নিজেদের পরিবর্তনশীলতা কখনোই কাটিয়ে উঠতে পারব না। সত্যিকার অর্থে পক্ষপাতমুক্ত হওয়া কখনোই আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। পূর্ণ নিরপেক্ষতা অর্জন একটি অসাধ্য কাজ। মানুষের এই সহজাত অক্ষমতাই আমাদের আরো সাবধান হতে সাহায্য করবে। আল্লাহকে ভয় করতে আর তাঁর দয়া লাভের উপযোগী আচরণ করতে সাহায্য করবে। আল্লাহ ইউসুফ আলাইহিসসালামের উক্তি উদ্ধৃত করেন,

وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ ۖ إِلَّا مَا رَزَحَمَ رَبِّي

“আমি নিজেকে দোষমুক্ত বলি না। (মানুষের) নফস তো কুমন্ত্রণা দিতেই থাকে। শুধু আল্লাহ যাকে দয়া করেন, সে-ই রক্ষা পায়।” (সূরাহ ইউসুফ ১২:৫৩)

কাজেই আমরা যদি কারো সমালোচনা করতে গিয়ে অবিচার না করতে চাই এবং সততা রক্ষা করতে চাই, তাহলে মানবমনের সহজাত পরিবর্তনশীলতাকে স্বীকার করতে হবে। আমাদের সব কাজই যে কোনো না কোনো চেতনা বা প্রভাবের ফলাফল, তা মাথায় রাখতে হবে। এ এক বিশাল আমানত। আল্লাহ বলেন,

لَا عِزٌّ لَّالْأَمَانَةِ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَيُّنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

“নিশ্চই আমি আসমান, জমিন ও পাহাড়ের কাছে এই আমানত পেশ করেছিলাম। তারা তা বহন করতে অস্বীকার করেছে ও ভয় পেয়েছে। কিন্তু মানুষ সে দায়িত্ব গ্রহণ করল। সে বড়ই অন্যায়কারী, বিরাট অজ্ঞ।” (সূরাহ আল-আহযাব ৩৩:৭২)

মানবীয় সীমাবদ্ধতার কারণে অবিচার করে ফেলার একটা সম্ভাবনা থেকেই যায়। এজন্যই নবি-রাসূলগণ জ্ঞান ও দয়া নিয়ে এসেছেন। তাঁদের জীবন দয়ায় ভরপুর ছিল। এই গুণের কারণেই অবিচার পরিহার করা নিশ্চিত করা যায়।

আল্লাহ কুরআনে খিজির আলাইহিসসালামের ব্যাপারে বলেন,

فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ﴿٦٥﴾

“তারপর তারা আমার এক বান্দাকে খুঁজে পেল, যাকে আমি অনুগ্রহ করেছি এবং আমার পক্ষ থেকে বিশেষ জ্ঞান দান করেছি।” (সূরাহ আল-কাহফ ১৮:৬৫)

আল্লাহ তাঁকে জ্ঞান ও দয়া এ দুটি নিয়ামতই দিয়েছেন। এই দুই গুণের সমন্বয়েই আমাদের সমালোচনা হতে পারে সুবিচারমূলক। দয়াবিহীন ধর্মীয় জ্ঞানেও আল্লাহর হিদায়াত থাকে না। তেমনি জ্ঞানহীন দয়াও ইসলামি শিক্ষার পরিপন্থী। নির্দয় আলিম বা দয়ালু মূর্খ, কারো কাছ থেকেই উপকৃত হওয়া সম্ভব নয়। প্রথমজন মানুষকে তাড়িয়ে দেবে, দ্বিতীয়জন তাদের ভুলের মধ্যে নিষ্ক্ষেপ করবে।

এজন্যই সালাফগণের মধ্যকার আলিমগণ বলতেন যে, অন্যের সাথে বিতর্কে অবতীর্ণ হওয়ার আগে দুটি গুণ অবশ্যই অর্জন করতে হবে—জ্ঞান ও সততা।

প্রথমটির দাবি হলো কখনোই অজ্ঞতা বা রাগের ভিত্তিতে তর্কে না নামা, দ্বিতীয়টি হলো নিজেকে অন্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ দেখানোর উদ্দেশ্যে তর্ক না করা।

সমালোচনা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ

সমালোচনায় যাতে অন্যের প্রতি অবিচার না হয়, তা ঠিক রাখার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো আত্মসংযম। আবেগ আর দেমাগ যেন আপনার বিবেকের নিয়ন্ত্রক না হয়ে বসে।

অন্যের সাথে তর্কে বা খণ্ডনযুদ্ধে লিপ্ত থাকা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারলে, ঠাণ্ডা মাথায় যেকোনো বিষয়ে দায়িত্বশীল লেখালেখি বা বক্তৃতা করা যায়। কিন্তু যখন সমালোচনার প্রসঙ্গ আসে, তখন অপর পক্ষের প্রতি আমাদের মনোভাব একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়।

মাথায় রাখতে হবে যে, কিছু কিছু পদ্ধতি সমালোচনার সঠিক তরিকা নয়। যেমন অপর পক্ষের ভুলের ফর্দ তুলে ধরা। এটা ব্যক্তি আক্রমণ ছাড়া কিছুই নয়। এছাড়াও কোনো বিষয়ে তাঁর মত স্পষ্ট জানা থাকলে শব্দচয়ন, কথার কথা বা বলার ভুল থেকে ভিন্ন অর্থ বের করে সমালোচনার বিষয় বানানো যাবে না। শুধু দোষ খুঁজে বেড়ানো অনুচিত। এটাও ব্যক্তি আক্রমণ।

একজন মুসলিম কখনোই অন্যকে অপদস্থ করার উদ্দেশ্যে দোষ খুঁজে বেড়ায় না। একবার উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে অভিযোগ এল যে, একদল লোক রাস্তায় জড়ো হয়ে মদপান আর হৈ-হুল্লোড় করছে। তিনি এর বিহিত করতে বেরিয়ে পড়লেন। ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখলেন তারা ততক্ষণে চলে গেছে। তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং তাদের খোঁজাখুঁজি না করে ফিরে এলেন।

মুসলিমদের পরবর্তী একজন শাসক মুয়াবিয়াহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, “আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আমাকে আদেশ করেছেন কখনোই মুসলিমদের গোপন দোষ খুঁজে খুঁজে বের করে উন্মোচন না করতে। কারণ এটা করার মাধ্যমে আমি তাদেরকে খারাপ বানিয়ে ফেলব।”[২৯]

নবিজি (ﷺ)-এর এই উপদেশ দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্পষ্ট করে দেয়:

১। মানুষের জীবন ও কাজকর্মের উপর গোয়েন্দাগিরি করে দোষ প্রকাশ করে দেওয়া যদি সমাজের নিয়ম হয়ে যায়, তাহলে মানুষ খুব খারাপভাবে একে অপরকে গালমন্দ করতে থাকবে। কেউ কেউ সত্য কথা বলবে তো বটে, তবে অনেকেই অজ্ঞতাবশত কথা বলবে। কেউ ন্যায়ানুগ আচরণ করবে আবার কেউ অন্যায় করে বসবে।

২। মানুষের দোষ প্রকাশ করে দিলে তারা আরো খারাপ হয়ে উঠবে। প্রত্যেকেই ভুল করে। কিন্তু এগুলোকে প্রকাশ করে দিলে মানুষ ভেবে বসবে ওটাই তার স্বভাব। তখন হয়তো সত্যিই সে সেটাকে স্বভাবে পরিণত করে ফেলবে। এই খারাপ দিকগুলোই তখন আড্ডা আর হাসি-তামাশার স্বাভাবিক বিষয় হয়ে যাবে।

সমালোচনার ক্ষেত্রে নবিজি (ﷺ)-এর এই উপদেশটি মনে রাখা উচিত। যেই ভুল নিয়ে কথা হচ্ছে, ততটুকুতেই সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। বৈধ মতপার্থক্যকে ভুল বলে দাবি করা থেকেও বিরত থাকতে হবে। বরং ওই মতটির ভালো ও খারাপ দিকগুলো তুলে ধরতে হবে।

এখান থেকে সমালোচনার আরেকটি মূলনীতি প্রসঙ্গক্রমে চলে আসে। যেই মতের সমালোচনা করতে চাই, সেটিকে সঠিকভাবে ও সঠিক প্রসঙ্গসহকারে উপস্থাপন করতে হবে। প্রসঙ্গ ছাড়া উপস্থাপন করলে সেটি এমনিই ভুল মনে হবে। পারিপার্শ্বিকতা সহ দেখলে যেটাকে খুবই যৌক্তিক কথা মনে হতো, প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে দিলে সেটাকেই মারাত্মক ভুল মনে হবে। সঠিক বক্তব্য আর শক্ত যুক্তির মধ্য থেকে একটি ভুল শব্দচয়ন বেছে নিয়ে সেটাকেই আলোচ্য বিষয় বানিয়ে ফেলা যাবে না।

দ্বীনি বিষয়ের বিতর্কে এটা আরো গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত অপর পক্ষও যদি আপনার মতোই সত্যানুসন্ধানী হয়। ইবনু তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ লিখেছেন:

“নবিজি (ﷺ)-এর কথার উদ্দিষ্ট অর্থ বের করার জন্য কেউ কোনো ব্যাখ্যা উপস্থাপন করলে তাকে কুফরের অপবাদ দেওয়া যাবে না। তিনি কিয়াসে ভুল করলে তাকে গুনাহগারও বলা যাবে না। ব্যবহারিক দ্বীনি জ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় আলোচনার ক্ষেত্রে এই সুপরিচিত মূলনীতি অধিকাংশ ব্যক্তিই অনুসরণ করে থাকেন। আকিদাহর বিষয়ে ভুল করা অসংখ্য মানুষকে কাফির বলে ঘোষণা করা হয়। নবিজি (ﷺ) সাহাবা ও তাঁদের অনুসারীদের মাঝে এই স্বভাব কখনোই দেখা যায়নি। সৎকর্মশীল পূর্বসূরি

আলিমগণও এ কাজ করেননি। বরং প্রথম জামানার বিদআতিরা নিজেরাই এই কাজ করত।”[৩০]

ইসলামের বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাস বা অতীতের আলিমগণের লেখা বইপত্র ঘাটাঘাটি করলে এমন কোনো বই পাবেন না, যেখানে একজন আলিম আরেকজন আলিমের ভুলের ফর্দ লিখে রেখেছেন। এমন তো না যে, কোনো আলিম কখনও ভুল করেননি এবং সেটা সংশোধনের উদ্দেশ্যে অন্যান্য আলিম বই লেখেননি বা বিতর্ক করেননি। দেখার বিষয় হলো তাঁদের সংশোধনের মধ্যমপন্থী পদ্ধতিটা। তাঁরা এমনভাবে একজন আরেকজনকে উপস্থাপন করতেন না, যা দেখে মনে হয় অপর ব্যক্তি তার ভুলত্রুটির জন্যই বিখ্যাত।

ফকিহ ইবনু হাযম আয-যাহিরির লেখাগুলোর কথাই ধরুন। অসাধারণ বুদ্ধিমান একজন আলিম, অনেকগুলো কাজে তাঁর মেধার দৃষ্টান্ত দেখা যায়। ইমাম আয-যাহিরির লেখা জীবনীভিত্তিক অভিধান ‘সিয়ারু আ’লামিন নুবালা’ গ্রন্থে এর কতগুলো দৃষ্টান্ত আলাদাভাবে তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু একইসাথে ইবনু হাযম এমন অদ্ভুত অদ্ভুত কিছু ভুল করেছেন, যা দেখে মনে হয় এমন একজন মানুষ এইসব ভুল কীভাবে করলেন! ইবনু হাযমের বুদ্ধিবৃত্তিক অর্জন নিয়ে কোনো বই সংকলন করা হলে তা হবে একজন কিংবদন্তী ইসলামি চিন্তাবিদে বর্ণনা। আবার শুধু ইবনু হাযমের ভুলগুলো সংকলন করেই একটি বই লিখা হলে মনে হবে যে, আক্ষরিক অর্থের বাইরে কিছু বোঝার মতো মেধা তাঁর ছিলই না।

আবু হামিদ আল-গাযালি সহ অন্যান্য আরো অনেক প্রখ্যাত আলিমের ব্যাপারেই একই কথা খাটে। এ কারণেই নবিজি (ﷺ) বলেছেন,

أَقْبِلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثْرَاتِهِمْ إِلَّا الْخُدُودَ

“যাদের অনেক প্রশংসনীয় ব্যাপার আছে, তাদের ছোটখাটো ভুলগুলো উপেক্ষা করো, হৃদয়ের[৩১] অপরাধ ব্যতীত।”[৩২]

সমালোচনায় সততা বড় জরুরি। নিজের পছন্দ ও পক্ষপাতিত্ব বাদ দিয়ে ন্যায়বিচার ও সততার ইসলামি শিক্ষাগুলো মেনে চলতে হবে। কখনোই যেন সত্য বিকৃত করে

[৩০] মিনহাজুস সুন্নাহ আন-নববিয়াহ: ৫/২৩৯০২৪০

[৩১] হৃদয় অর্থাৎ চোরের হাতকাটা, রজমের শাস্তি ইত্যাদি

[৩২] সুন্নাহ আবু দাউদ: ৪৩৭৫, সুন্নাহ আন-নাসাঈ আল-কুবরা: ৭২৯৪।

কারো সাথে অবিচার না করি। মানী লোককে তার প্রাপ্য সম্মান দিতে হয়। বর্তমান সমাজে সংস্কারকর্মের অনেক দরকার আছে বটে। কিন্তু তা করতে হবে সততা ও দয়া সহকারে। শুধু ভুল ধরার জন্যই ভুল ধরা বা সেগুলোকে অযথা বড় করে দেখানো যাবে না। তবে কেউ আমাদের দ্বীনের অকাট্য বিষয়গুলোর বিপরীত কিছু বললে সে ব্যাপারে অবশ্যই যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে।

অনেকসময় মানুষ কিছু শেখা বা উপকৃত হওয়া ছাড়াই কোনো আলিম বা দাঈর লেখা বই পড়ে শেষ করে ফেলে। কিন্তু যখন ভুল ধরা বা খণ্ডন করার উদ্দেশ্যে পড়ে, তখন প্রতিটা শব্দ-বাক্য খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খেয়াল করে।

মানুষকে সংশোধন করতে হলে নম্রভাবে করুন। নবিজি (ﷺ) বলেন,

إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ

“নম্রতা যাতেই প্রবেশ করে, সেটিকেই সুন্দর করে তোলে। আর এর অনুপস্থিতিতে তা হয়ে ওঠে কদর্য।” [৩৩]

নবি (ﷺ) আরো বলেন,

يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ

“আইশা, আল্লাহ দয়ালু এবং তিনি দয়াশীলতা পছন্দ করেন। দয়াপ্রদর্শনকারীকে তিনি যা দেন, সীমালঙ্ঘনকারীকে তা দেন না। আমাদের দয়ার কারণে তিনি আমাদের এমন সব জিনিস দেন, যা অন্য কোনো কিছুর জন্য দেন না।” [৩৪]

আল্লাহ কুরআনে আমাদের উপদেশ দেন,

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۚ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

“তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান করো হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে বিতর্ক করো সর্বোত্তম পন্থায়।” (সূরাহ আন-নাহল ১৬:১২৫)

[৩৩] সহিহ মুসলিম: ২৫৯৪

[৩৪] সহিহ আল বুখারি: ৬৯৭২, সহিহ মুসলিম: ২১৬৫

এই আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, বিতর্কে সম্ভাব্য সর্বোত্তম পন্থা অবলম্বন জরুরি। দাওয়াহ কেবল ‘ভালো’ হলেই চলবে, কিন্তু বিতর্ক হতে হবে ‘সর্বোত্তম’। এর একটি কারণ হতে পারে বিতর্কের সময় মানুষের আবেগী বা দেমাগী হয়ে পড়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। রাগ উঠে যাবার সম্ভাবনা থাকে, ফলে বিবাদমান পক্ষগুলো একে অপরের উপর জুলুম করে ফেলে।

আল্লাহ আমাদের যে সত্য প্রদান করেছেন, তা একটি আমানত। এই সত্যকে অন্যের কাছে পৌঁছে দেওয়া ও ভুল ধারণা দূর করা একটি ইবাদাত। সং কাজের আদেশ, অসং কাজের নিষেধ ও মিথ্যার অপনোদন এর সাথেই সম্পর্কিত। এই ঈমানী দায়িত্বগুলো সম্মান, শালীনতা ও সদাচরণের মাধ্যমে আদায় করতে হবে। এসব দায়িত্ব পালন করা মানেই অপরকে গালমন্দ করার লাইসেন্স পেয়ে যাওয়া নয়।

গালমন্দ বা উস্কে দেবার ভঙ্গিতে সমালোচনা করা ঠিক নয়। প্রতিপক্ষকে দমন করার উদ্দেশ্যে সমালোচনা করা সত্যসন্ধানের পদ্ধতি নয়। এ তো কেবল আধিপত্যের লালসা মাত্র। ইসলাম আমাদের যে আচরণ শিক্ষা দেয়, তার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

রাসূল (ﷺ)-এর জীবনের দিকে তাকান। একটিবারের জন্যও তিনি এসব আচরণ করেননি। তাঁর সাহাবি ইমরান বিন আল-হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা থেকে জানা যায় নবিজি ছিলেন “দয়ালু ও সংবেদনশীল”। আরেক সাহাবি মালিক বিন আল-হুয়াইরিস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তিনি ছিলেন “নম্র”। ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু আমাদের জানান, “তাঁর সামনে কাউকে কখনও অপদস্থ হতে হতো না।”

কেউ নেতাগিরি দেখাতে শুরু করলে অমান্য করা মানুষের স্বভাব। প্রতিবাদ মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতি। এ কারণেই নবিজি (ﷺ)-কে আল্লাহ বলেন,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۚ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

“আল্লাহর রহমতেই আপনি তাদের জন্য কোমল হৃদয় হয়েছেন। পক্ষান্তরে আপনি যদি রাগী ও কঠিনহৃদয় হতেন, তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। কাজেই আপনি তাদের ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য মাগফেরাত কামনা করুন এবং কাজে কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন।” (সূরাহ আলে ইমরান ৩:১৫৯)

আবার মুসা আলাইহিসসালামকে আল্লাহ বলেন,

﴿٤٤﴾ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لِّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ

“তোমরা তার সাথে নম্র কথা বলবে, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে,
অথবা ভয় করবে।” (সূরাহ ত্বা-হা ২০:৪৪)

দয়া ও নম্রতার ফলে মানুষ কাছে আসে, কঠোরতার ফলে দূরে সরে যায়।

ইসলামি আকিদাহর কিছু অকাট্য বিষয় আছে, যা মেনে চলতে মুসলিমরা বাধ্য। মানবদরদ ও মানবাধিকার রক্ষাও ইসলামের অপরিহার্য অংশ। মানবতাকে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ মানুষকে সীমাবদ্ধতা ও মায়া-মমতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। মানুষ স্বভাবতই তার প্রতি রূঢ় আচরণকারীদের প্রতিহত করে। আপনার কথা যদি সঠিকও হয়, তবুও ককর্শ আচরণ করে অপর পক্ষের বিরোধিতার শিকার হওয়ার কী দরকার? ককর্শ আচরণ করলে কিন্তু সেটা আর আদর্শ বনাম আদর্শের লড়াই থাকছে না। তখন সেটা হয়ে যায় আপনার আদর্শ বনাম প্রতিপক্ষের মানবীয় স্বভাব। আপনার আদর্শ হয়তো ঠিকই আছে, কিন্তু প্রতিপক্ষের মানবীয় স্বভাব তখন আপনার আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধী হয়ে ওঠে।

কুরআন তার শিক্ষাগুলো কীভাবে প্রতিষ্ঠিত করছে দেখুন। অনেক জায়গায় এর হুকুমগুলো পরোক্ষভাবে বলা হয়েছে। যেমন- অমুক কাজটা যারা করে, তাদের প্রশংসা করা এবং তাদের জন্য বিরাট পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া; অথবা যারা এই কাজ পরিত্যাগ করে, তাদের তিরস্কার করা। কুরআন ভালোর আদেশ দেয় ও মন্দ থেকে নিষেধ করে। মানবপ্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল পদ্ধতিতে এটা করা হয়। আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তাই তিনি জানেন কীভাবে তাদের বোঝাতে হয়। এ কারণেই নৈতিকতা ও সদাচরণের কুরআনীয় শিক্ষাগুলো সকল মানবসমাজে স্বীকৃত।

সদাচারবিহীন সমালোচনার ফলে সমালোচিত ব্যক্তি তার ভুল কাজটি আরো বেশি করে করতে শুরু করে।

নিরপেক্ষতা

নিরপেক্ষতা হলো সঠিক মূল্যবোধের একটি অংশ। ভারসাম্যের আকাঙ্ক্ষা, ভিন্নতা মেনে নেবার মানসিকতা, বাস্তবসম্মত চিন্তাচেতনা, আর সবটুকু না জেনে পক্ষে নেয়ার অনীহা থেকেই নিরপেক্ষতার জন্ম। আমাদের সালাফরা বিশেষ এক বাচনভঙ্গিতে নিরপেক্ষতা প্রকাশ করতেন। তাঁরা বলতেন, “আমার জানা নেই।”

এমনকি তাঁদের কেউ কেউ এমনও বলেছেন, “জ্ঞানের অর্ধেক হলো ‘আমার জানা নেই’ বলতে পারা।” অথবা “যে ‘আমার জানা নেই’ বলা ছেড়ে দিয়েছে, সে জ্ঞানকে বিপদে ফেলে দিয়েছে।”

এই কথাটা অন্যভাবেও বলা যায়— “আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।” এভাবে বললে পুরো ব্যাপারটা মীমাংসার ভার সত্যিকারের সর্বজ্ঞ সত্তার হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়ে গেল।

ইসলামি ধর্মতত্ত্ব ও শরিয়ত শাস্ত্রের আলিমগণ এটি বোঝাতে একটি শব্দ ব্যবহার করেন—তাওয়াক্কুফ (রায় স্থগিত)। অনেকসময় এমন হয় যে, কোনো বিষয়ে একাধিক মত বিদ্যমান এবং প্রত্যেক মতের পক্ষেই পর্যাপ্ত প্রমাণ রয়েছে। সেক্ষেত্রে একদম সঠিকটা বের করে আনার ব্যাপারে অপারগতা বা সতর্কতাবশত আলিমগণ তাওয়াক্কুফ করেন। এটা কোনো চূড়ান্ত রায় নয়, বরং আরো প্রমাণ পাওয়ার আগ পর্যন্ত একটি সাময়িক অবস্থান।

উমর রাহিয়াল্লাহু আনহু একবার মিন্বরে দাঁড়িয়ে বক্তব্য দেওয়ার সময় বলেন যে, “ওয়া ফাকিহাতাও ওয়া আব্বা” আয়াতে (সূরা আবাসা ৮০:৩১) ‘আব্ব’ শব্দটির অর্থ কী, এ ব্যাপারে তিনি সুনিশ্চিত নন। একই ঘটনা আবু বকর রাহিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারেও বর্ণিত হয়েছে। সত্যি বলতে প্রত্যেক যুগের প্রত্যেক আলিমই কোনো না কোনো ব্যাপারে চূড়ান্ত রায় দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।

একবার এক ব্যক্তি রাসূল (ﷺ) এর কাছে এসে বলল, “হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় স্থান কোনটা?”

রাসূল (ﷺ) বললেন, “জিবরিলকে জিজ্ঞেস না করে বলতে পারব না।” জিবরিল আলাইহিসসালাম রাসূল (ﷺ) কাছে এসে জানিয়ে দিলেন, “আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় স্থান মসজিদ আর সবচেয়ে অপ্রিয় স্থান বাজার।” [৩৫]

আজকালকার অনেক মানুষের স্বভাব এর একদম বিপরীত। জানুক বা না জানুক, প্রতিটা ব্যাপারে তাদের হুটহাট কিছু একটা বলাই লাগবে। এদের কথার যে কোনো মূল্য নেই, তা তারা নিজেরাও জানে। আরেকজনের প্রতি রাগের কারণেই কখনও কখনও এরা একেবারে বিপরীত একটা মত প্রদান করে। এক্ষেত্রে বিষয়টির সঠিক বুঝ অর্জন করে তবেই মুখ খোলাকে এরা পূর্বশর্ত বলে মনেই করে না। তারা একটা জিনিসের ভুল অর্থ বের করে নিয়ে সমালোচনা শুরু করে। কারণ ওই বিষয়ের ও তার প্রমাণগুলোর ব্যাপারে সূক্ষ্ম ও সঠিক বুঝ তাদের নেই।

মিডিয়ার কারণে সাধারণ মানুষ আরো বেশি দুঃসাহসী হয়ে উঠেছে। নীরবতা মানেই তাদের কাছে দুর্বলতা ও আত্মসম্মানহীনতা। যেকোনো বিষয়ে একটা না একটা মত দেওয়ার জন্য প্রচুর সামাজিক চাপ থাকে। হোক তা ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি, বা যেকোনো কিছু।

এমন পরিবেশে কেউ গতকাল কী মত দিয়েছে আর আজকে কী মত দিল, তা মনে রাখার সময় কারো নেই। এত হৈ-হুল্লোড়ের মাঝে কারো কথার অধারাবাহিকতা ধরাও পড়ে না। তার উপর কোনো বিষয় যতক্ষণ বিখ্যাত থাকে, ততক্ষণ মানুষকে বিভক্ত করে রাখে। প্রত্যেকেই হয় এই দল নাহয় ওই দলের সাথে। হয় আপনি ‘পক্ষ’, নয়তো ‘বিপক্ষ’। মাঝামাঝি কিছু যেন থাকতে নেই। এরপর একে অপরকে খণ্ডন করার পেছনে মানুষ বিপুল পরিমাণ সময়, শ্রম ও সম্পদ নষ্ট করে। এই খণ্ডনযুদ্ধের পেছনে জ্ঞানের রসদ আবার খুব একটা থাকে না।

ইশ্যু আসে, ইশ্যু যায়। কোনো একটা বিষয়ে কথা শুরু হয়। প্রথমে দেখে মনে হবে এত মাথা ঘামানোর কিছু নেই। একটু পর দেখা যায় চারিদিকে সেটা নিয়েই কথা হচ্ছে। মানুষ সেটা নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে পড়ে যেন পৃথিবীতে আলোচনার ওই একটি বিষয়ই আছে। এটার ভিত্তিতে মানুষ শত্রু-মিত্র তৈরি করে নেয়। তারপর হঠাৎ একদিন সেটা নিয়ে আর কোনো কথা নেই। এসেছে নতুন ইশ্যু, তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান। তাহলে আগের ইশ্যুর পেছনে যে এতদিন তারা এত শ্রম, সময় আর আবেগ বিনিয়োগ করেছে, সেখান থেকে কী লাভ হলো?

তর্কের বিষয় যদি হয় ধর্মীয় কোনো ব্যাপার, তাহলে তো মানুষ কালামে পাক থেকে নিজের মতের পক্ষে দলীল টেনে বের করে। এভাবে তারা নিজেদের পরম নির্ভুলতার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে যায়। নিজেদের ব্যাখ্যা ও উপলব্ধিকে তারা আল্লাহর অকাট্য বাণী ভেবে বসে।

খেয়াল করলাম পশ্চিমের কিছু কটর ডানপন্থী বলে, “হয় আপনি আমাদের পক্ষে, নয়তো আমাদের বিরুদ্ধে।” আর কিছু মুসলিম চরমপন্থীর অবস্থা এরচেয়ে ভয়াবহ। তারা বলে, “হয় আপনি আমাদের পক্ষে, নয়তো আল্লাহর বিরুদ্ধে!”

নিজেকে, অপরকে, আর আমাদের বিশ্বাস করা মূল্যবোধগুলোকে আমরা সম্মান করতে শিখব কবে? প্রিয় জিনিসগুলোকে তুচ্ছ বিতর্কে ব্যবহার করে সেগুলোর মর্যাদাহানি করবেন না। কোনো বিষয়ে আমাদের মত যদি সঠিক হয়ও, তবু সেটাকে হক-বাতিলের চিরন্তন দ্বন্দ্ব হিসেবে উপস্থাপন করার তো দরকার নেই।

আমাদের সালফে সালিহীনরা নিরপেক্ষতার যে নীতি মেনে চলতেন, আমাদের এ আচরণ তা থেকে একেবারেই আলাদা।

এ পথ, ও পথ

জীবনে প্রডাক্টিভ কিছু পেতে চাইলে সে পথে অগ্রসর হওয়ার পদ্ধতি জানতে হয়। চলার পথের বাধা-বিপত্তি সম্পর্কে ধারণা রাখতে হয়। অনেক মানুষ এমন আছে যে, গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ শুরু করে ঠিকই, কিন্তু পরে আর চালিয়ে যেতে পারে না। কোনো না কোনো সমস্যা এসে তাদের শুরুর উদ্যম নষ্ট করে দেয়। কেউ সমালোচনা নিতে পারে না। কেউ পরিবার বা পেশা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কেউ এমনিই মনোযোগ হারিয়ে ফেলে। একটা বিষয়ে বেশিদিন আগ্রহ ধরে রাখতে পারে না।

অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, পরিশ্রমী মানুষেরা দুটি পথের যেকোনো একটি বেছে নেয়। এই সিদ্ধান্তের উপরই তাদের সাফল্য নির্ভর করে। একটি পথে উত্তরোত্তর সাফল্য, আরেকটায় শুধুই হতাশা।

১। সূর্যের পানে চলো

এটা সাফল্যের রাজপথ। উদ্যোগ, অগ্রীম ভাবনা, ও মনোযোগের পথ। এই পথে থাকার অর্থ ঘন ঘন পেছনে না তাকানো। এর অর্থ অন্যেরা কী বলল বা করল, সে ব্যাপারে মাথা না ঘামানো। ভুল আপনার হতেই পারে, কিন্তু সে ভুল আপনাকে থামিয়ে দেবে না। বরং চেষ্টা-পরিশ্রম বাড়িয়ে দিয়ে আপনি সেই ভুল সংশোধন করে নেবেন। আলোচনা-বিতর্ককে আপনি এতটাও বাড়তে দেবেন না, যার ফলে কাজে ব্যাঘাত ঘটতে পারে।

একজন সালাফের ব্যাপারে বর্ণনা এসেছে যে, এক অলস লোক একবার তাঁর সাথে কথা বলার উদ্দেশ্যে তাঁর কাজ থামিয়ে দিতে চাইল। তিনি সেই অকর্মাকে বললেন, “সূর্যের পানে চলো।”[৩৬]

[৩৬] ঘটনাটি আমির বিন কায়সের নামে প্রচলিত। দেখুন: ইবনুল জাওযি, আত-তাবসিরাহ ২/৩১৫

এখান থেকেই আমি এ অংশের শিরোনামটি নিয়েছি। প্রোডাক্টিভ কাজে যথাসম্ভব বেশি সময় বিনিয়োগ করতে হবে। এর অর্থ এই না যে, আপনি গঠনমূলক সমালোচনাকে আমলেই নেবেন না। কেউই ভুলের উর্ধ্বে না। আপনার ভুল সংশোধনের উদ্দেশ্যে সমালোচনা করার অধিকার অন্যদের আছে। সেইসাথে প্রত্যেকের প্রত্যেকটা কথাই জবাব দেওয়ারও আবার কোনো দরকার নেই। কাজের কাজ করতে গেলে ঐক্যমত্যে সম্মতির দরকার হয় না। আপনার কথা আপনি বলুন, অন্যদেরকে তাদের কথা বলতে দিন। সময়ই বলে দেবে কার কথা বেশি সঠিক ছিল। সময়ের আবর্তনে অনেক পরামর্শ আর তর্ক একেবারেই নিষ্ফল বলে প্রমাণিত হয়। কিছু বিষয় নির্দিষ্ট কিছু পরিস্থিতিতে কার্যকর হলেও বাকি সব পরিস্থিতিতে অকার্যকর হয়ে পড়ে।

সূর্যের পানে চলার অর্থ চলার পথে সামনের দিকে মনোযোগ ধরে রাখা। সাফল্য আরো কতটা বাড়ানো যায়, নতুন নতুন কোন সুযোগ কাজে লাগানো যায়, সে চিন্তায় মগ্ন থাকা। এর অর্থ একই জিনিস বারবার আলোচনা করার প্রবণতা কমানো, কাজটা ঠিক হবে কি হবে না এ নিয়ে ইতস্তত ভাব কমিয়ে আনা। একটা জিনিস ঠিক না বেঠিক, তা নিশ্চিতভাবে জানতে পারার জন্য একটু সময় দরকার হয়।

২। চক্রাকারে ঘুরে বেড়ানো

এটি দ্বিতীয় পথ। চিন্তাবিদ, কর্মী, লেখক যে কেউই এ পথে থাকুক না কেন, সে একই কাজ বারবার করতে থাকে। সে সব আপত্তির জবাব দেয়, সারাক্ষণ নিজের পক্ষে সাফাই গায়। এই পথের পথিকরা অন্যদের প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ দেয়। শুধু তা-ই না, তাদের বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগও করে নেয়। কাউকে নিষ্ঠাহীন, কাউকে হিংসুক, কাউকে নিষ্ঠাবান শ্রেণিতে রাখে। এই পথিকরা যেহেতু চারপাশের মানুষগুলোর সাথে চিরকাল বুদ্ধিবৃত্তিক আর মৌখিক যুদ্ধে লিপ্ত থাকে, সেহেতু তাদের শত্রু-মিত্র চিহ্নিত করে নিতে হয়।

কিন্তু ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি, হৃদয় আর জীবন চলার পথে এই ক্লাস্তিকর বিতর্কের নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। এই মানুষগুলো একটি কাজের পেছনেই এত সময় ব্যয় করে ফেলে যে, তা আর কখনো শেষই হয় না। বিতর্ক করা আর সাফাই গাওয়ার পেছনে অনেক সময়-শ্রম চলে যায়। ছোট পরিসরের মধ্যম গুরুত্বের একটি প্রকল্পই চিরকাল চলতে থাকে। এমনকি সত্যিকারের গুরুত্বপূর্ণ কাজেও দরকারের চেয়ে বেশি সময় দেওয়া ঠিক না। তর্ক আর সাফাইয়ের পেছনে খরচ হওয়া সময় একেবারেই অনর্থক।

এই ফাঁদে পড়াটা দুর্ভাগ্য। স্বেচ্ছায়, অতি আবেগে, প্রতিযোগিতার উত্তেজনায় এ সমস্যা হয়। কিন্তু এতসব পরিশ্রমে সত্যিকারের কোনো ফলাফল আসে না।

আমাদের শক্তি আর সময় একেবারেই সীমিত। (সাধারণত জীবনের প্রডাক্টিভ সময় হলো ২০ থেকে ৫০ বছর বয়স)। একবার এটি উপলব্ধি করতে পারলেই আমরা আর এদিক-সেদিকে মনোযোগ দেবার আগ্রহ পাব না। তখন খাদ থেকে উঠে এসে দ্রুত গঠনমূলক কাজে লেগে যাব। নিদ্রাকদের বেশি পাত্তা দিতে হবে না, তাদের নিয়ে অভিযোগও করা যাবে না। তাদের ব্যাপার আল্লাহর হাতে ছেড়ে দিন।

وَمَا رُبُّكَ بِظَالِمٍ لِّلْعَبِيدِ

“নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর বান্দাদের উপর কখনও জুলুম করেন না।” (সূরাহ ফুসসিলাত ৪১:৪৬)

সত্যিকারের সমালোচনা কখনো একটি ভালো পরিকল্পনাকে ধ্বংস করে দেয় না। বরং একে শক্তিশালী করে, এর সঠিকতা নিশ্চিত করে, এতে পরিপক্বতা আনে। এ ধরনের সমালোচনার উদ্দেশ্য থাকে ধারণাটির দুর্বল দিকগুলো মেরামত করা। কোনো পরিকল্পনার কার্যকারিতা অস্পষ্ট হলে গঠনমূলক সমালোচনার মাধ্যমে এর শক্তি ও দুর্বলতাগুলো সামনে আসে।

এই দ্বিতীয় পথে আসার একটি প্রধান কারণ হলো অহংকার। নিজেকে সঠিক প্রমাণ করাই লাগবে, এরকম মনোভাবের কারণে মানুষ গুরুত্বপূর্ণ ও প্রডাক্টিভ কাজ ফেলে বিতর্ক আর সাফাইয়ে আত্মনিয়োগ করে।

এই গেল দুটি পথের আলোচনা। একইসাথে দুটি পথ অনুসরণ করার আশা করাটা বোকামি। আপনার একটিই পাকস্থলি। অস্বাস্থ্যকর খাবার আর পানীয় গ্রহণ করতে থাকলে স্বাস্থ্যকর খাবারের জন্য আর জায়গা থাকবে? তেমনি সারাটা সময় যদি অন্যদের কথা নিয়ে পড়ে থাকেন, তাদের আপত্তিগুলো নিয়ে গবেষণা করেন, পাল্টা জবাব লিখতে থাকেন, তাহলে আর কিছু করার সময় পাবেন? অপ্রয়োজনীয় কাজে জীবনের মূল্যবান সময়গুলো চলে যেতে থাকবে।

মনে রাখবেন, অন্যের আপত্তি খণ্ডন করাটা খুব অল্প ক্ষেত্রেই সঠিক কাজ হিসেবে গণ্য হয়। কারণ এর মাধ্যমে তো আপনার কোনো উন্নতি হচ্ছে না। এখন যে জায়গায় আছেন, সেটাকেই রক্ষা করে চলেছেন। ফলে আপনার চিন্তাচেতনার উন্নতি-উৎকর্ষ খুব একটা আর হয় না। বরং একটু সময় নিয়ে আবেগকে থিতিয়ে আসতে দিন। নিরপেক্ষতার সাথে এবং উপকৃত হওয়ার মানসে সব দিক বিবেচনা

করার মতো শান্ত পরিস্থিতি আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। তার আগ পর্যন্ত যে কাজ করছিলেন, তা চালিয়ে যান।

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

﴿৭৩﴾

“যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্ম করেছে; তারা ভবিষ্যতের জন্য সংযত হলে, বিশ্বাস স্থাপন করলে ও সৎকর্ম করলে পূর্বে যা ভক্ষণ করেছে, তার জন্য দোষী হবে না। অতএব, সংযত থাকো, বিশ্বাস স্থাপন করো এবং সৎকর্ম করতে থাকো। আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।”
(সূরাহ আল-মায়িদাহ ৫:৯৩)

অস্থির মানসিকতা

জীবনে সমস্যা থাকেই। বর্তমান মুসলিম বিশ্বের অধিবাসীদের জন্য এ কথা আরো বেশি সত্য। এই লেখাটি লেখার সময় বিশ্বে চলমান ত্রিশটি যুদ্ধের মধ্যে আটশটিই সংঘটিত হচ্ছে মুসলিম বিশ্বে। বিশ্বের নানা প্রান্তের মানুষ নানারকম সমস্যায় জর্জরিত, এটি অস্বীকার করার উপায় নেই। পার্থক্য হলো অন্যান্য জায়গার সমস্যাগুলো শক্তিমত্তা আর প্রযুক্তিগত অগ্রগতির ফল, যেখানে আমাদের মুসলিম বিশ্বের সমস্যাগুলো দুর্বলতা আর প্রযুক্তিগত পশ্চাৎপদতার ফল।

এই তিক্ত সত্য আমাদের মাঝে এক মানসিক অস্থিরতার জন্ম দেয়। এতে আমাদের চিন্তাপদ্ধতি আর চারপাশকে বোঝার ক্ষমতা প্রভাবিত হয়। সেইসাথে ঘরের ও বাইরের মানুষদের সাথে আমাদের সম্পর্কেও প্রভাব পড়ে।

সমস্যা ও সংকটগুলোকে প্রসঙ্গের বাইরে নিয়ে অযথা বড় করে দেখাটা আরো বড় একটি সমস্যা, মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা। এ অবস্থায় জীবনে ঘটে যাওয়া অন্যান্য ইতিবাচক জিনিসগুলো উপেক্ষা করা হয়। বিদ্যমান সুযোগগুলো তো চোখ এড়িয়ে যাবেই, সংকটকে সুযোগে পরিণত করার বুদ্ধিও মাথায় আসবে না।

সংকীর্ণ দৃষ্টি নিয়ে সমস্যার দিকে তাকাতে গিয়ে বৃহত্তর চিত্রটির ব্যাপারে আমরা অজ্ঞ থেকে যাই। ফলে সংকটকে যথাযথভাবে মোকাবেলা করতে পারি না। এই ভারসাম্যহীন দৃষ্টিভঙ্গিই অস্থির মানসিকতার জন্ম দেয়। এ এক মারাত্মক রোগ। কোনো সমস্যা বা সংকটের সত্যিকার স্বরূপ বুঝতে পারা এক জিনিস। আর ওই সমস্যাকেই কিয়ামত ভেবে সেটার পেছনেই জীবন ধ্বংস করে ফেলা আরেক জিনিস।

সময়ের আবর্তনে একসময় বোঝা যায় সমস্যাটির স্থায়িত্ব আসলে কতটুকু। সমস্যার ভেতর দিয়ে যাবার সময় মানুষ সেটাকে কত বড় ভেবেছিল আর বাস্তবেই সেটা কতটা বড়, এ দুটির মাঝে অবশ্যই পার্থক্য আছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মানুষ সেটাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখে। আর মনোযোগকামী মিডিয়া কীভাবে সেটা উপস্থাপন করে, তা তো বলাই বাহুল্য।

ইরাক সংকটসহ আরো অন্যান্য বৈশ্বিক সমস্যা যেন বৃহত্তর সমস্যার কথা আমাদের ভুলিয়ে না দেয়। আর তা হলো পশ্চাৎপদতা, দুর্বলতা ও অপদস্থতার সমস্যা।

অস্থির মানসিকতা প্রকাশ পায় একগুঁয়েমি, গোঁড়ামি ও অসহিষ্ণুতার মাধ্যমে। আমরা সমালোচনা গ্রহণ করতে, সংশোধিত হতে ও ভুল স্বীকার করতে অপারগ হয়ে যাই। অন্যান্য দৃষ্টিভঙ্গির সাথে আমরা শত্রুতা লাগিয়ে দিই আর ভালো কাজে পরস্পর সহযোগিতা করতে ভুলে যাই। অস্থির মানসিকতা পর্যালোচনামূলক চিন্তাধারার জন্য ক্ষতিকর। সঠিকভাবে কারণ ও ফলাফল বোঝার ক্ষমতা তখন থাকে না। সমস্যার পেছনের মূল অনুঘটকগুলো খুঁজে বের করতে আলস্য বোধ হয়।

অস্থির মনমানসের কাছে ধূসর বলে কিছু নেই, সবই সাদা নয়তো কালো। “হয় আপনি আমাদের পক্ষে, নয়তো আমাদের বিরুদ্ধে।” সমঝোতা ও আংশিক সমাধানকে গ্রহণযোগ্য মনে করা হয় না। এ থেকে জন্ম নেয় গোঁয়ারত্বমি, আর অসম্ভব হয়ে পড়ে ইতিবাচক সংস্কার। ব্যক্তিগত বুঝকে বানানো হয় ধ্রুব সত্য। এই মানসিকতার দুটি লক্ষণ হলো—অভিযোগপ্রবণতা আর তুচ্ছ বিষয়ে অতি আগ্রহ। মানুষ যৌক্তিক চিন্তাভাবনা করে সমস্যার গোড়ায় না পৌঁছে যাকে-তাকে বলির পাঁঠা বানিয়ে ফেলে।

এই মানসিকতা যে সমাজে ছড়িয়ে পড়ে, সেখানে সারাক্ষণই নাগরিক অসন্তোষ, মতবিরোধ আর ব্যাপক অবিচার ছড়িয়ে পড়ে। মানুষ একজন আরেকজনের শ্রম পণ্ড করে দেয়। ফলে যোগফল বেশিদূর এগোয় না। ব্যর্থতা ছড়িয়ে পড়ে মহামারির মতো। অর্থনীতি, পরিবার, ব্যবসা, লোকপ্রশাসন, বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি, মানসিক স্বাস্থ্য সবকিছুই আক্রান্ত হয়।

অস্থির মানসিকতার রোগীদের মূল সমস্যা হলো নিজেদের ভুল বুঝতে না পারায় সংস্কারের কোনো ইচ্ছে পোষণ না করা। তাদের অজ্ঞতা বড় জটিল। কোনটা সঠিক, তা তা জানে না; তারা যে জানে না, সেটাও তারা জানে না।

কুরআন আমাদের শিক্ষা দেয় নিজেদের জ্ঞানের ব্যাপারে বিনয়ী হতে এবং সবসময় হিদায়াত কামনা করতে। আমরা প্রতি ওয়াক্তে সূরাহ আল-ফাতিহায় পড়ি,

“আমাদের সরল পথ প্রদর্শন করুন।” (সূরাহ আল-ফাতিহা ১:৫)

আমরা নিজেদের জ্ঞান নিয়ে নিশ্চিত থাকতে অস্বীকৃতি জানাই। নিজের বুঝ নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে গেলেই স্থবিরতা সৃষ্টি হয়, বুদ্ধিবৃত্তিক অগ্রগতি থমকে দাঁড়ায়। আল্লাহ আমাদের এ থেকে রক্ষা করুন।

অন্তরের শান্তি

অন্তরের শান্তিই সকল শান্তির উৎস। অন্তর যার প্রশান্ত, সে অন্যদের সাথেও শান্তিতে থাকে। মুসলিমরা প্রত্যেক সালাতের তাশাহহুদে বলে, “শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের উপর এবং আল্লাহর সৎ বান্দাদের উপর।” আল্লাহ বলেন,

فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةٌ

“ঘরে প্রবেশের সময় নিজেদেরকে সালাম প্রদান করবো।” (সূরাহ আন-নূর ২৪:৬১)

এখানে ‘নিজেদের’ বলতে একদল মানুষকে বোঝানো হয়েছে। আসলেই আত্মার অন্তস্থল থেকেই শান্তি তথা সালাম বিকিরিত হয়।

নিজের সাথে নিজের সম্পর্ক স্বচ্ছ থাকলে, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অটুট থাকলে এবং অন্তরের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলে তবেই অন্তরের শান্তি অর্জিত হয়। প্রতিপালকের সম্পর্কে জ্ঞানের পরই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান হলো আপন আত্মার ব্যাপারে ও এর পরিশুদ্ধির ব্যাপারে জ্ঞান।

আপনার সামর্থ্য ও মেধার প্রতি যত্নশীল হোন, দুর্বলতা ও শক্তির ব্যাপারে হোন সচেতন। আপনি কি ধীরস্থির না তাড়াহুড়াপ্রবণ, চঞ্চল না শান্ত, আপনি কি নাছোড় স্বভাবের না এর বিপরীত? নিজের ব্যাপারে সত্যটা না জানলে আপনি বুঝতে পারবেন না শক্তি-সামর্থ্য কোন পথে ব্যবহার করলে সর্বোচ্চ উপকার পাবেন।

এর মানে এই না যে, অস্তিত্বের প্রকৃতি বা মানবাত্মার রহস্য নিয়ে গভীর গবেষণায় ডুব দিতে হবে। ওহীর মাধ্যমে যা জানানো হয়েছে, এর বাইরে এ সম্পর্কিত জ্ঞান আমাদের আয়ত্তের বাইরে। আল্লাহ বলেন,

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ۚ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

“তারা তোমাকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলো, ‘আত্মা আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে হুকুম, যার ব্যাপারে তোমাদের সামান্যই জ্ঞান দেওয়া হয়েছে।’ (সূরাহ আল-ইসরা ১৭:৮৫)

তবে আপনার ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিক, সুপ্ত মেধা, ও সত্যিকারের স্বভাব আবিষ্কার করা কিন্তু অসম্ভব নয়। তারপর এই জ্ঞান ব্যবহার করে আপনি ভালো কিছু অর্জন করতে এবং মন্দ পরিহার করতে পারবেন।

ইসলামি শরিয়ত মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি বিবেচনায় নিয়েই হুকুম-আহকাম দেয়। নবি-রাসূলগণের ক্ষেত্রেও এ কথা সত্য। তাঁরাও নিজেদের স্বভাব-প্রকৃতি অনুযায়ী কাজ করেছেন। তাঁরাও তো মানুষ, এর বেশিও নন, কমও নন। নবিজি (ﷺ) বলেছেন,

ইবরাহিম আলাইহিসসালাম এর তুলনায় আমাদের মনে অধিক সন্দেহ জাগতে পারে। তিনি বলেছিলেন, “হে আমার প্রতিপালক! কীভাবে আপনি মৃতকে জীবিত করেন, আমাকে দেখান।” আল্লাহ বললেন, “তবে কি তুমি বিশ্বাস করোনি?” তিনি উত্তরে বললেন, “কেন করব না? তবে তা কেবল আমার চিত্ত প্রশান্তির জন্য।” (২: ২৬০)। আল্লাহ তাআলা লৃত আলাইহিসসালাম এর উপর রহমত বর্ষণ করুন, তিনি কোনো শক্তিশালী জনগোষ্ঠীর আশ্রয় গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। ইউসুফ আলাইহিসসালাম এর দীর্ঘ কারাবরণের মতো আমাকেও যদি কারাগারে অবস্থান করতে হতো, তবে আমি রাজদূতের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বসতাম। (সহিহ আল-বুখারি এবং সহিহ মুসলিম)

ইবরাহিম আলাইহিসসালাম জ্ঞান অন্বেষণ করেছিলেন এবং বস্তুর সত্যিকার প্রকৃতি জানতে চেয়েছিলেন। এটার কারণ ছিল তাঁর স্বাভাবিক মানবীয় কৌতূহল মেটানো। মুহাম্মাদ (ﷺ) ইউসুফ আলাইহিসসালামের ব্যাপারে বলেছেন যে, তাঁর সমপরিমাণ কারাগারে থাকতে হলে “আমি রাজদূতের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বসতাম।” তিনি এখানে আমাদের স্বাভাবিক মানবপ্রকৃতির কথা বলেছেন। স্বভাবতই আমরা মুক্তির প্রতি লালায়িত। বন্দীত্বকে আমরা ঘৃণা করি, বিশেষত যদি তা এত লম্বা সময় ধরে আমাদের শক্তি-সামর্থ্যকে বাধা দিয়ে রাখে।

মূসা আলাইহিসসালাম নিজের ব্যাপারে জানতেন এবং নিঃসংকোচে ও অকপটে নিজের অনুভূতি ব্যক্ত করতেন। তিনি নিজের স্বাভাবিক ভয়ের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, “আমি যখন তোমাকে (ফিরআউনকে) ভয় পেতাম, তখন তোমার কাছ থেকে পালিয়েছিলাম।” আরো বলেছেন, “হে প্রতিপালক! আমি ভয় করি সে আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে অথবা আমাদের অত্যাচার করবে।” দেখা যাচ্ছে

মুসা আলাইহিসসালাম নিজের ব্যাপারে জানতেন এবং সেভাবেই নিজেকে গ্রহণ করে নিয়েছেন। স্বাভাবিকভাবে যতটুকু সামর্থ্যে কুলায়, ততটুকু ভার নিয়েই তিনি লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে সাজাতেন।

আমরা মুখে যেসব মূলনীতি ও মূল্যবোধের কথা বলি, অন্তরও তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। এই মূল্যবোধের মাধ্যমেই আমরা আমাদের প্রতিপালকের সাথে সম্পর্কিত হই আর এর ভিত্তিতেই নিজেদের কথা ও কাজকে সাজাই। এই সত্য ও শাস্ত মূল্যবোধগুলোই আমাদের আচরণের ভিত্তি হওয়া উচিত। নইলে সারাক্ষণই অমুককে খুশি করা, তমুককে অখুশি না করা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে। আমাদের জীবন হয়ে উঠবে ভান আর চাটুকারিতাময়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আর স্বাধীনতা হারানোর ভয়ে সারাক্ষণ চারপাশের মানুষদের কাছে আত্মসমর্পণ করে থাকতে হবে।

অন্তরের প্রশান্তির একটি দিক হলো ভেতরের সত্ত্বার সাথে বাইরের আচরণের মিল। আমাদের কাজকর্ম যেন হয় আমাদের কথার প্রতিফলন। আল্লাহ বলেন,

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٣﴾

“তোমরা যা করো না, তা বলা আল্লাহর কাছে গুরুতর অপরাধ।” (সূরাহ আস-সফ ৬১:৩)

তার মানে আমাদের কর্মপদ্ধতি হতে হবে সৎ ও সঠিক। রাসূল (ﷺ) এই জিনিসটি ভালোমতো ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। সুফিয়ান বিন আব্দুল্লাহ আস-সাকাফি রাব্বিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করলেন,

يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ

“হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে বলুন, যাতে এ ব্যাপারে আর কাউকে জিজ্ঞেস না করা লাগে।”

রাসূল (ﷺ) বললেন,

قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ فَاسْتَقِمَّ

“বলো, ‘আমি ইসলামে বিশ্বাস করি।’ তারপর এতে অবিচল থাকো।”^{৩৭}

ইবাদাত যেভাবে করি, মানুষের সাথে আচরণও সে অনুযায়ী হওয়া চাই। ইবাদাত আমাদের জাগতিক কাজকর্মের দিকনির্দেশক হবে। আমাদের ন্যায়পরায়ণ হতে ও অপরের অধিকারকে সম্মান করতে উৎসাহ যোগাবে। মাসজিদে এক চেহারা আর বাইরের দুনিয়ায় আরেক চেহারা দেখালে চলবে না।

বকধার্মিক লোকদের কারণে অনেক বিপর্যয় আসে। আমাদের ঈমান এত মজবুত ও গভীর করতে হবে, যেন তা জীবনের সকল পরীক্ষা ও বিপদে খুঁটি হয়ে দাঁড়ায়। বাসায়, কর্মস্থলে, নিজের ভেতর অনেকরকম সমস্যা ও হতাশা আসে। এগুলো সহ্য করে বিজয়ী হতে হলে আল্লাহর প্রতি ঈমান দৃঢ় হতে হবে। এই ঈমানের সঙ্গী হবে অন্তরের অন্তস্থল থেকে আসা নিষ্ঠা, যা আমাদের বাহ্যিক ইবাদাতে মূর্ত হয়ে উঠবে।

অন্তরের শান্তির জন্য দরকার আশা-আকাঙ্ক্ষাকে নিজের সামর্থ্যের সীমায় বেঁধে রাখা। রাসূল (ﷺ) বলেন, “হে বিশ্বাসীরা! নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করো। তোমরা ক্লান্ত হলেও আল্লাহ ক্লান্ত হন না। অল্প অল্প করে হলেও নিয়মিত যে আমল করা হয়, সেটিই আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয়।” (সহিহ আল-বুখারি)

এই উপদেশ সব জায়গায় খাটে। যেমন বস্তুগত সুখের পেছনে ছুটতে গিয়ে টাকার লোভের কারণে মানুষ ধ্বংস হয়ে যায়।

আমরা যা প্রচার করি, তার সাথে আমাদের সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। আপনি যে দিকে আহ্বান করবেন, গোটা পৃথিবীর সবাই এর প্রতি ইতিবাচক সাড়া দেবে না। এমনটা হয় না, এমনটা আশা করাও ঠিক না। এমনকি আল্লাহর মনোনীত রাসূলগণকেও সবাই মেনে চলেনি। আপনি যেটার জন্যই কাজ করেন না কেন, কেউ না কেউ ঠিক এটার বিপরীত কাজ করছে।

অন্তরের শান্তির জন্য প্রয়োজন নিজের অনন্য স্বভাবের সাথে সামঞ্জস্য। যেটা যার স্বভাবের সাথে যায় না, সে সেটা গ্রহণ করতে পারবে না। রাসূল (ﷺ)-এর সামনে খাবার হিসেবে এক জাতের কাঁটাওয়ালা লেজের সরীসৃপ পেশ করা হয়েছিল। তিনি তা খেলেন না। খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বিষয়টা লক্ষ করে জিজ্ঞেস করলেন, এই প্রাণীটা খাওয়া হারাম কি না। রাসূল (ﷺ) বললেন, “না। আমার এলাকায় ওটা খায় না বলে আমার রুচি হয় না।” তিনি খাননি, কারণ তাঁর পছন্দ না। প্রশ্নটা হালাল-হারামের না, ব্যক্তিগত রুচির।

সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুমের ক্ষেত্রেও একই কথা। প্রত্যেকের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ছিল। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু চেয়ে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু আলাদা। বদরের

যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে সিদ্ধান্তের কথাই ধরুন। ওহী নাজিল হওয়ার আগ পর্যন্ত যতক্ষণ বিভিন্ন মত দেওয়ার সুযোগ ছিল, ততক্ষণ প্রত্যেক সাহাবির মতের মধ্যে নিজ নিজ ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠেছে। আবু বকর শান্তশিষ্ট ও সহনশীল মানুষ। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) নিজেও এ কথার স্বীকৃতি দিয়েছেন। উমর ছিলেন শক্তিমান আর দৃঢ় স্বভাবের, এটাও রাসূল (ﷺ) আমলে নিয়েছেন।

আমাদেরও নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য বুঝে নিয়ে তার সাথে মানিয়ে নিতে হবে। ব্যক্তিগত গুণাবলি আর মেজাজকে অস্বীকারের মাধ্যমে জোর করে ভান ধরে থাকা যায় না।

উমর বিন আব্দুল আযীয বলেছেন, “সবচেয়ে মনোরম জিনিস হলো, যখন কারো ব্যক্তিগত পছন্দ ইসলামের শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।”

আমাদের আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীরের প্রতি সন্তুষ্ট থাকতে হবে। এই সন্তুষ্ট থাকার অর্থ তাকদীরের কারণেই তাকদীরের ক্ষতি এড়ানোর পন্থা অবলম্বনের চেষ্টা করা। প্লেগ আক্রান্ত এক এলাকায় প্রবেশ করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যথার্থই বলেছেন, “আমরা আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীর থেকে পলায়ন করে আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীরের দিকেই যাই।”

তাকদীরকে মুমিন পূর্ণরূপে মেনে নেয়। যা বিলম্বিত করা হয়েছে, তা নিয়ে তাড়াহুড়া করতে নেই। যা দ্রুত নিয়ে আসা হচ্ছে, তা স্থগিত করতে নেই। মুমূর্ষু রোগী, কুৎসিত চেহারাধারী, দুর্বল চিন্তের অধিকারী, অবিবাহিত-অবিবাহিতা, ইয়াতীম সহ যেকোনো ধরনের দুর্দশা ভোগকারী ব্যক্তির উচিত প্রথমে আল্লাহর এই তাকদীরের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হতে শেখা। তারপর নিজের বাসনা পূরণে বাস্তবসম্মত ও বৈধ উপায়-উপকরণ অবলম্বন করা এবং সাধ্যের বাইরের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করা।

ন্যায়পরায়ণ ও পক্ষপাতহীন হওয়াটাও অন্তরের শান্তি অর্জনের শর্ত। এর জন্য স্বার্থপরতা, অসার কামনা, ও লোভ-লালসা ত্যাগ করতে হবে। মহান সাহাবি আমাদের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, “কেউ যদি তিনটি জিনিস অর্জন করে, তাহলে ঈমানের স্বাদ বুঝতে পারবে। নিজের প্রতি ন্যায়বিচার করা, সকলকে সালাম দেওয়া, অভাবের সময়েও দান করা।” (সহিহ আল-বুখারি)

মতভেদ হলে নিজেকে অন্যের জায়গায় বসিয়ে কল্পনা করলে কেমন হয়, যাতে পুরো বিষয়টাকে একবার তার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়? অন্তত এতটুকু তো মেনে নেয়া যাবে যে, তারা নিজেদের জন্য ওটাই চায়। আমি নিশ্চিত যে, নিজের প্রতি সত্যিই সং থাকা লোক খুবই অল্প। এদের প্রতি আল্লাহ মহা অনুগ্রহ

করেছেন। রাসূল (ﷺ) বলেছেন, “ভাইয়ের চোখে ধূলা দেখতে পাও অথচ নিজের চোখে ময়লা দেখতে পাও না!”

অন্তরের প্রশান্তির আরেকটি শর্ত হলো রাসূলগণ গায়েবের ব্যাপারে যে জ্ঞান নিয়ে এসেছেন, তা মেনে নেয়া। সত্যিকার বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও সঠিক যুক্তির সাথে এগুলোর কোনো বিরোধ নেই। উপকথায় তো সত্য-মিথ্যা নির্বিশেষে সব গালগল্প মিশ্রিত থাকে। আমরা এই মনোভাবে আক্রান্ত না হয়েই গায়েব বা অদৃশ্যের জ্ঞানে বিশ্বাস করি। গায়েবের ব্যাপারগুলো মানবমনের ক্ষমতার উর্ধ্বে, আর গালগল্প-কিছাকাহিনী মানবমনের চেয়ে নিচু স্তরের। আমাদের অবশ্যই যুক্তি প্রয়োগ করতে হবে এবং অন্ধবিশ্বাস ত্যাগ করতে হবে। হৃদয়কে সৃষ্টি করা হয়েছে বুদ্ধিবৃত্তির হাতিয়ার হিসেবে, শুধুই তথ্যের ভাণ্ডার হিসেবে নয়।

প্রখ্যাত কাযি ও ফকিহ ইযযুদ্দিন বিন আব্দুস সালাম এটি ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন যে, মানবকল্যাণ করার এবং অকল্যাণ প্রতিরোধ করার জ্ঞান ওহী নাজিলের আগ থেকেই যুক্তিগ্রাহ্য। আমি যোগ করছি যে, ওহী নাযিলের পরও এগুলো যুক্তিগ্রাহ্য আছে। এভাবেই আমরা কুরআন-সুন্নাহ বুঝি এবং বিভিন্ন ফাতওয়ার মাঝে তুলনা করি। আমরা উপকার-অপকার বিবেচনায় নিয়ে সিদ্ধান্ত দিই। মানবহৃদয়ের সত্যিকার সামর্থ্যকে খাটো করেও দেখি না, অতিরঞ্জিতও করি না। কিছু সীমার বাইরে আমাদের মন আর যেতে পারে না।

আমাদের মন যেসব ওয়াসওয়াসা দ্বারা আক্রান্ত হয়, সেগুলোর নিয়ন্ত্রণ নেয়াও জরুরি। এগুলো আমাদের ইবাদাত ও জাগতিক কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। বেশিরভাগ ওয়াসওয়াসাই মনস্তাত্ত্বিক (যেমন, ঠিকমতো ওয়ু করার পরও পবিত্রতা অর্জন হয়নি বলে মনে হওয়া। – অনুবাদক)। এগুলোর সবচেয়ে ভালো চিকিৎসা হলো জোর করে সেসব সংশয়কে উপেক্ষা করা, সেগুলোকে সময় না দেওয়া। রাসূল (ﷺ) দেখানো তরিকা অনুযায়ী সূরাহ ইখলাস তিলাওয়াত করে আল্লাহর কাছে সাহায্য ও আশ্রয় চাওয়া।

আমাদের সবটুকু আত্মিক শক্তি জড়ো করে এই ওয়াসওয়াসা উপেক্ষা করতে হবে। বিশেষত ওয়ু-গোসলের ব্যাপারে। আল্লাহ আমাদের এ থেকে মুক্ত হওয়ার পথ দেখিয়ে দেবার আগ পর্যন্ত এসব ওয়াসওয়াসা হলো কিছু জিনিস উপেক্ষা করার অনুমোদন। আমাদের অন্তরের নিষ্ঠার ব্যাপারে আল্লাহ অবগত আছেন। আর আল্লাহ নিষ্ঠাবানদের সাহায্যকারী।

সহাবস্থান করতে শেখা

সহাবস্থানের কথা উঠলেই মুসলিম সমাজের কিছু মানুষ খুব সতর্ক হয়ে উঠেন। তারা ভাবেন সহাবস্থান করতে হলে আমাদের ইসলামি শরিয়ত ত্যাগ করতে হবে। অথবা তারা ভাবেন এটা আসলে ইসলামের ভেতর বিজাতীয় ধ্যানধারণা প্রবেশ করানোর ফাঁদ।

সহাবস্থানের ব্যাপারে মুসলিমদের আরেকটি সন্দেহের কারণ হলো তারা একে পশ্চিমে জন্ম নেয়া একটি ধারণা বলে মনে করেন। পশ্চিমা হওয়ায় এই জিনিসটার মাধ্যমে ইসলামি সংস্কৃতিকে বিলুপ্ত করে দিতে যায়, যাতে মুসলিম বিশ্ব পশ্চিমের প্রতিচ্ছবি হয়ে যায়।

এই সতর্ক ও সংবেদনশীল মনোভাব অবশ্যই সম্মানের দাবিদার। তবে আসল কথা হলো সহাবস্থানের ধারণাটি একটি ইসলামি শিক্ষা। কুরআন-হাদিস এই ধারণাকে সমর্থন করে।

কিছু মানুষ অসদুদ্দেশ্যে ‘সহাবস্থান’ শব্দটা ব্যবহার করে বলেই এটাকে ঘৃণা করা উচিত নয়। শাক্তিক পার্থক্য নিয়ে বেশি চিন্তিত হওয়ার দরকার নেই। আমরা দেখব অর্থটা। যৌক্তিকভাবে পর্যবেক্ষণ করে তবেই আমরা একটি বিষয়কে গ্রহণ বা বর্জন করব।

আমাদের মূলনীতি হলো “জ্ঞান মুমিনের সম্পদ। যেখানেই সে তা পাবে, তার অধিকারই এর উপর সবচেয়ে বেশি হবে।” (সুনান আত-তিরমিযি)

ঈমানের ব্যাপারে সমঝোতা করে নিজেদের কিছু বিশ্বাস করা, এর সাথে সাংঘর্ষিক অন্য ধর্মের কিছু বিশ্বাস করাকে যদি সহাবস্থান বলা হয়, তাহলে তা একেবারেই ভুল। এটি সহাবস্থানের নেতিবাচক অর্থ। আল্লাহ বলেন,

أَفْتُمْنُونَ يَغْضُ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ يَغْضُ

“তাহলে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস করো ও কিছু অংশ অবিশ্বাস করো?” (সূরাহ আল-বাকারাহ ২:৮৫)

উল্টোদিকে সহাবস্থানের খুবই ইতিবাচক আরেকটি অর্থ আছে, যা অতি উচ্চমানের একটি নৈতিক মূল্যবোধ। এর অর্থ হলো পারস্পরিক যোগাযোগ, সংলাপ, এবং শান্তি ও উন্নতির জন্য একসাথে কাজ করতে সম্মত হওয়া। এতে প্রয়োজন ভিন্নতার অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়ে সেগুলোকে সম্মান করা।

ইসলামে সহাবস্থানের অর্থ এটিই। আধুনিক ‘সহাবস্থান’ শব্দটির চেয়ে অনেক স্পষ্ট ও শ্রেয় ভাষায় কুরআন এর ব্যাপারে কথা বলেছে। যেমন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

“হে মানবজাতি! আমি তোমাদের এক পুরুষ ও এক নারী হতে সৃষ্টি করেছি, তারপর তোমাদের করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্র, যাতে তোমরা পরস্পরকে জানতে পারো।” (সূরাহ আল-হুজুরাত ৪৯:১৩)

“পরস্পরকে জানা” শুধু নির্দিষ্ট নাম বা গোত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সমগ্র মানবজাতিকে এখানে জ্ঞান, শিক্ষা ও ইতিবাচক মেলামেশা বিনিময় করতে বলা হচ্ছে। এর প্রমাণ আল্লাহর এই বাণী:

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“যে সম্প্রদায় তোমাদের পবিত্র মসজিদে যেতে বাধা দিয়েছিল, তাদের প্রতি শত্রুতাবশত তোমরা যেন সীমালঙ্ঘন না করে ফেলো। সৎকাজ ও আল্লাহভীতিতে পরস্পরকে সহযোগিতা করো। আর পাপাচার ও সীমালঙ্ঘনে পরস্পরকে সহযোগিতা কোরো না। আল্লাহকে ভয় করো। তিনি কঠোর শাস্তিদাতা।” (সূরাহ আল-মায়িদাহ ৫:২)

দ্বীনের মৌলিক ব্যাপারে অপর পক্ষ আমাদের সাথে একমত হোক বা না হোক, ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে কল্যাণকর ও ভালো কাজে পরস্পরকে সাহায্য করতে। দেখার বিষয় হলো সহযোগিতাতা যেন পাপাচার, অবিচার ও জুলুমের পথে না হয়। পরস্পরকে জানা ও সাহায্য করার ব্যাপারটিতে তাই সমগ্র মানবজাতি অন্তর্ভুক্ত। এই মূল্যবোধগুলো মানবতার কল্যাণ বয়ে আনে। সে অনুযায়ী কাজ করলে মানুষ আমাদের কাছে আসবে, ইসলামের কাছে আসবে।

মানুষ ও তাদের পরিস্থিতি বিভিন্নরকম হয়ে থাকে, এ তো একদম জানা কথা। আল্লাহই চেয়েছেন যে, তা এমন হবে। তিনি বলেন,

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۚ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴿١١٨﴾ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ

“এবং যদি তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করতেন, তাহলে তিনি সকল মানুষকে একই মতাবলম্বী করে দিতেন। কিন্তু তোমার প্রতিপালক যার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, সে ব্যতীত বাকিরা মতভেদ করতেই থাকবে। আর এজন্যই তিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন।” (সূরাহ হূদ ১১:১১৮-১১৯)

নানা মুনির নানা মত থাকার অর্থ এই না যে, ভালো আর খারাপ বলে কিছু নেই। মতভেদের অস্তিত্বই বরং ভালো আর মন্দের মাঝে স্পষ্ট পার্থক্যের প্রমাণ। সহাবস্থান করার অর্থ নিজেদের মূল্যবোধ প্রচার বন্ধ করে দেওয়া নয়। একসাথে থেকেই আমরা অপরের সাথে উত্তম পন্থায় বিতর্ক করতে, সংকাজের আদেশ দিতে ও অসং কাজের নিষেধ করতে পারি। এগুলো ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

সহাবস্থান অর্থ পারস্পরিক কল্যাণের জন্য শান্তিপূর্ণভাবে সহযোগিতা করা, সার্বজনীন মূল্যবোধের শক্তিতে প্রতিবেশী হয়ে বাস করা আর মতবিনিময়ের জন্য সংলাপের সুযোগ সৃষ্টি করা।

মুমিনরা পৃথিবীকে উন্নততর করতে চায়। তারা সং কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধকারী জাতি। সত্য তুলে ধরা, মিথ্যেকে খণ্ডন করা, জ্ঞান ছড়িয়ে দেওয়া ও অজ্ঞতা দূর করার জন্য তারা সর্বোত্তম পদ্ধতিতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করে।

সবচেয়ে খারাপ স্বভাবগুলোর একটি হলো নিজেকে ধ্রুব সত্যের ঠিকাদার বানিয়ে নেয়া, তা সে যে নাম ব্যবহার করেই করা হোক না কেন। নিজের দৃষ্টিভঙ্গিকে বিতর্কের এতই উর্ধ্বে মনে করা যে, অন্য সবাইকে বিচার করা নিজের জন্য জায়েয বানিয়ে ফেলা।

এ ধরনের আচরণ ইসলামি শিক্ষার বিপরীত। ইসলামে বিশ্বাস করুক বা না করুক, শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান করতে চাওয়া প্রত্যেকের জীবনকে ইসলাম পবিত্র বলে ঘোষণা করে।

ইতিহাসজুড়ে এমনটিই হয়ে এসেছে।

ইসলামের প্রথম শহর, যেখান থেকে ইসলাম দূরদূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছে, সেই মদিনার সমাজেই ইসলামি সহাবস্থানের অসাধারণ দৃষ্টান্ত রয়েছে।

ইসলাম যখন প্রথমবারের মতো শক্তিশালী ও স্বাধীন অবস্থায় পৌঁছল, তখনই আল্লাহরই ইচ্ছায় নানা মতের মানুষের সহাবস্থান ঘটল। মদিনায় ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ইয়াহুদি ও পৌত্তলিক ছাড়াও বাস করত বিশাল সংখ্যক মুনাফিক ও দুর্বল ঈমানের মুসলিম। ছোট একটি শহরে এরা সবাই পাশাপাশি বাস করত।

এমনকি আল্লাহর ইচ্ছায় রাসূল (ﷺ)-এর মৃত্যুর পর তাঁর ঢাল একজন ইয়াহুদির কাছে বন্ধক ছিল। এ থেকেই বোঝা যায় যে, একসাথে বসবাসের এই মূলনীতি চিরন্তন এবং আমাদের দ্বীনের প্রতিষ্ঠিত ধারণা। এই বিধান রহিত হয়ে যাওয়ার প্রমাণ কেউ দেখাতে পারবে না।

মানবতার বিকাশ ও সভ্য জীবনযাপনের জন্য যে পদ্ধতিতে পৃথিবীর মানুষেরা পারস্পরিক সহযোগিতা ও জ্ঞান বিনিময় করে, সেটাই সহাবস্থান। যেসব অভিজ্ঞতা আমাদের আরো ভালোভাবে বাঁচতে শেখাবে, সেগুলোর জ্ঞান আমরা বিনিময় করি। যেসব মূল্যবোধ আমরা সার্বজনীনভাবে স্বীকার করি, সেগুলোর বিকাশের একটি পথ হলো সহাবস্থান। এই পরিবেশেই আমরা অপরকে ইসলামের দিকে আহ্বানের সুযোগ লাভ করি। এর অর্থ এই না যে, এক পক্ষই অপর পক্ষকে নিজের দিকে আহ্বান করবে। এর অর্থ পার্থিব ও ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গঠনমূলক আলোচনার সুযোগ সৃষ্টি করা।

সাহাবিগণ যথার্থই উপলব্ধি করেছিলেন যে, তাঁদের দ্বীন তাঁদের চারপাশের মানুষদের দ্বীন থেকে একেবারেই আলাদা। বিশ্বাস, ধর্মগ্রন্থ, ইবাদাতের পদ্ধতি—সবখানে এই পার্থক্য শক্ত শেকড় মেলে আছে। তবুও সেখানে অনেক বিষয়ে পরস্পরের মাঝে মিলও আছে। আর পার্থিব ব্যাপারে মিলের কথা তো বলাই বাহুল্য।

আমরা দেখি আল্লাহর বাণী:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾

“বলো, ‘হে কিতাবীগণ, তোমরা এমন কথার দিকে এসো, যেটি আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সমান। আমরা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদাত না করি। আর তার সাথে কোনো কিছুকে শরীক না করি এবং আমাদের কেউ আল্লাহ ছাড়া কাউকে রব হিসাবে গ্রহণ না করি।’

তারপর যদি তারা বিমুখ হয়, তবে বলো, ‘তোমরা সাক্ষী থাকো যে, নিশ্চয় আমরা মুসলিম।’” (সূরাহ আলে ইমরান ৩:৬৪)

পৃথিবীতে যত মানুষ এসেছে বা আসবে, সবার চেয়ে রাসূলগণের ঈমান ছিল বেশি। তারপরও তাঁরা তাঁদের জাতির স্পষ্ট কাফির লোকগুলোর মাঝে বসবাস করেছেন। নূহ আলাইহিসসালাম তাঁর জাতির মাঝে ৯৫০ বছর বাস করেছেন। কুরআন বলে:

قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ﴿٥٠﴾ فَلَمْ يَرُدُّهُمْ دُعَايِي إِلَّا فِرَارًا ﴿٥١﴾ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ﴿٥٢﴾ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جَهَارًا ﴿٥٣﴾ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ﴿٥٤﴾ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿٥٥﴾

“সে বলল, ‘হে আমার প্রতিপালক! আমি তো আমার কওমকে রাত-দিন আহ্বান করেছি। অতঃপর আমার আহ্বান কেবল তাদের পলায়নই বাড়িয়ে দিয়েছে। আর যখনই আমি তাদেরকে আহ্বান করেছি যেন আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন, তারা নিজেদের কানে আঙুল ঢুকিয়ে দিয়েছে, নিজেদেরকে পোশাকে আবৃত করেছে, (অবাধ্যতায়) অনড় থেকেছে এবং দম্ভভরে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছে। তারপর আমি তাদেরকে প্রকাশ্যে আহ্বান করেছি। অতঃপর তাদেরকে আমি প্রকাশ্যে এবং অতি গোপনেও আহ্বান করেছি। আর বলেছি, তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা চাও; নিশ্চয় তিনি পরম ক্ষমাশীল।’” (সূরাহ নূহ ৭১:৫-১০)

নূহ আলাইহিসসালাম তাঁর জাতিকে ঈমানের দিকে দাওয়াহ দিয়েছেন, যৌক্তিক ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিতর্ক করেছেন ও তাদের সুস্থ বিবেকের কাছে আবেদন করেছেন। এ সবই সহাবস্থানের অংশ।

সহাবস্থানের অর্থ নিজের মতের স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলা নয়, ধর্মত্যাগ তো নয়ই। আপনার ব্যক্তিগত বিশ্বাস আপনার পরিচয়ের অংশ। কেউ আপনাকে আপনার বিশ্বাস পরিবর্তনে জোর করার অধিকার রাখে না। যা থাকা উচিত নয়, তা হলো মানবতার উপর চেপে বসা দম বন্ধ করা গোঁড়ামি ও অমূলক উত্তেজনা। আমাদের দরকার উন্মুক্ত যোগাযোগসুবিধা, যেখানে আমরা উত্তম পদ্ধতিতে মানুষকে আহ্বান করতে পারব।

সহাবস্থান মানে নিজের মতের পক্ষে গোঁড়ামি ত্যাগ করা এবং অপরকে নিজের মত গ্রহণে বাধ্য না করা। নিজের বিশ্বাস পরিত্যাগ করা বা সবার কথাকে সমানভাবে সঠিক মনে করাও সহাবস্থানের অর্থ নয়।

সহাবস্থানই শক্তি

বড় দুঃখ নিয়ে আজ বলতে হয় যে, মুসলিমদের কিছু গোষ্ঠীর চিন্তাজগতে সহাবস্থান নামক ধারণাটির কোনো জায়গাই নেই। মুসলিমদের সাথে অন্য ধর্মাবলম্বীদের সহাবস্থানের আলোচনা তো অনেক পরের ব্যাপার। মুসলিমরাই আজ মুসলিমদের সাথে সহাবস্থানে রাজি নয়। ভিন্ন মাজহাবের অনুসারী, ভিন্ন দলের কর্মী, ভিন্ন দেশের নাগরিক... এমনকি আরবের ভেতর ভিন্ন গোত্রের সদস্য হওয়ার ছুতোয় তারা একে অপরকে দেখতে পারে না। এই বিভক্তি কখনো কখনো সংঘাতে রূপ নেয়। দেখে মনে প্রশ্ন জাগে—কেন এমন হলো?

অনেক মানুষ সহাবস্থানকে মনে করেন দুর্বল অবস্থায় জীবন বাঁচানোর একটি কৌশল। এটা একদমই ভুল ধারণা। বিশ্বের দিকে তাকিয়ে দেখলে বোঝা যায় সহাবস্থানের শেকড় দৃঢ় হয়ে ডালপালা ছড়িয়ে পড়ে শক্তিশালী অবস্থায়। যে সমাজগুলো শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পক্ষে কথা বলে, সেগুলোই আবার সফলভাবে যুদ্ধ ঘোষণার সামর্থ্য রাখে। উল্টোদিকে যারা দুর্বল, তারা না শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে আর না যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারে। দুর্বলতা আর অস্থিতিশীলতার সময়েই সহাবস্থানের ধারণাটি সংকটে পড়ে যায়।

ঝগড়া বা অশান্তি না লাগিয়ে মতপার্থক্যকে স্থান দেওয়া ও বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করা চাউখানি কথা নয়। এর জন্য শক্তি প্রয়োজন। একটি নির্দিষ্ট মত চাপিয়ে দেওয়াকে শক্তি বলে না। রাসূল (ﷺ) বলেন, “কুস্তিতে যে অপরকে ধরাশায়ী করে, সে শক্তিশালী নয়। রাগের মাথায় নিজেকে যে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, সে-ই আসল শক্তিশালী।” (সহিহ আল-বুখারি এবং সহিহ মুসলিম)

খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু আল-আকসা (জেরুজালেম) শহরের চাবি গ্রহণ করতে সেখানে প্রবেশ করেন। তাঁকে গির্জার ভেতর সালাত আদায়ের আমন্ত্রণ জানানো হলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি সে সময় শক্তিশালী অবস্থায় ছিলেন এবং বিজিত শহরে যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারতেন। গির্জার ভেতরে সালাত আদায় করা ভুল কিছু নয়, তবু তিনি রাজি হননি। দূরদর্শিতা আর সংবেদনশীলতার প্রমাণ রেখে তিনি বলেন, “আমি আশংকা করি

যে, আমি ভেতরে সালাত আদায় করলে ভবিষ্যতেও মুসলিমরা একই জায়গায় সালাত আদায় করতে চাইবে। তখন গির্জার লোকেরা অস্বস্তিতে পড়ে যাবে।”

উমর গির্জার বাইরে সালাত আদায় করেন এবং খ্রিষ্টানদের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেন।

মুসলিমদের সাথে করা চুক্তি ভঙ্গ করে রিচার্ড দ্য লায়নহাট একবার ২৭০০ মুসলিম যুদ্ধবন্দীকে হত্যা করে তাদের দেহ অ্যাকর শহরের দেয়ালে দেয়ালে ঝুলিয়ে দেন। অথচ সালাহউদ্দীন আল-আইউবি আল-আকসা পুনরুদ্ধার করার পর সেখানকার ইয়াহুদি ও খ্রিষ্টান সহ সকলের জান-মালের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি চাইলেই কিন্তু প্রতিশোধ নিতে পারতেন। তা না করে তিনি ১১৯২ সালের ২ সেপ্টেম্বর রিচার্ডের সাথে রামলা চুক্তি স্বাক্ষর করেন। চুক্তির শর্তানুযায়ী শহরের নিয়ন্ত্রণ থাকবে মুসলিমদের হাতে, কিন্তু খ্রিষ্টান তীর্থযাত্রীদের জন্যে শহরের ফটক খোলা থাকবে। মধ্যযুগের ইতিহাসে সহাবস্থানের এ এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

মুসলিমরা ইতিহাসে অনেকবার শক্তিশালী ও বিজয়ী অবস্থায় থেকেছে। একইসাথে মুসলিম ইতিহাস সহাবস্থানের বাস্তব নমুনা। এ হলো শান্তিচুক্তি, সমঝোতা ও সন্ধির ইতিহাস।

আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা চুক্তি রক্ষা করো।” (সূরাহ আল-মায়িদাহ ৫:১)

আল্লাহ আরো বলেন,

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولَ

“চুক্তি রক্ষা করো। জেনে রেখো, চুক্তির ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।”

(সূরাহ আল-ইসরা ১৭:৩৪)

রাসূল (ﷺ) বলেন, “মুসলিমদের সাথে চুক্তিবদ্ধ কাফিরকে যে হত্যা করে, সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। অথচ জান্নাতের ঘ্রাণ চল্লিশ বছরের ভ্রমণের দূরত্ব থেকেও পাওয়া যায়।”

একবার রাসূল (ﷺ) একটি লাশবাহী দল দেখলেন। তিনি এর জন্য উঠে দাঁড়ালেন। তাঁকে জানানো হলো যে, এটি এক ইয়াহুদীর লাশ। তিনি বললেন, “সে কি মানুষ নয়?” (সহিহ আল-বুখারি ও সহিহ মুসলিম)

সাইপ্রাসের বাদশাহর উদ্দেশ্যে ইবনু তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ এর লেখা চিঠিটি দেখা যাক:

“সাইপ্রিয়টের রাজার ধার্মিকতা, দয়া ও জ্ঞানপিপাসার ব্যাপারে আমি জানতে পেরেছি। দেখেছি শাইখ আবুল আব্বাস আল-মাকদিসি কীভাবে রাজার নম্রতা, দয়াশীলতা, আতিথেয়তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দিয়েছেন। সেইসাথে তিনি পুরোহিত ও তাঁদের সমপর্যায়ের ব্যক্তিবর্গের প্রতিও ধন্যবাদ জানিয়েছেন। আমরা এমন এক জাতি, যারা সকলের কল্যাণকামী। আমরা আশা করি আল্লাহ যেন আপনাকে দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় কল্যাণ দান করেন।”

ইবনু তাইমিয়াহ রহিমাহুল্লাহ তাঁকে শুধু মুসলিম যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি দেওয়ার আহ্বান জানিয়েই ক্ষান্ত হননি। তাতারি, ইয়াহুদি, খ্রিষ্টান বন্দীদের ক্ষেত্রেও একই আহ্বান জানিয়েছেন। বলেছেন,

“ইয়াহুদি-খ্রিষ্টান সহ আমাদের আইনি নিরাপত্তার অধীনে থাকা সকলকে আপনি মুক্তি দেবেন বলে আমরা আশা করছি। মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে আমাদের কোনো নাগরিককেই আমরা ফেলে যাব না। সেইসাথে জেনে রাখুন, আমাদের অধীনে থাকা খ্রিষ্টান যুদ্ধবন্দীরা আমাদের সদাচরণ ও দয়ার ব্যাপারে জানে। এই আচরণের ব্যাপারে সর্বশেষ রাসূল (ﷺ) আমাদের আদেশ দিয়ে গেছেন।”

দুর্ভাগ্যবশত পরাজিত মানসিকতার মানুষেরা সহাবস্থানের ভাষাকে দুর্বলতার স্বীকৃতি বলে মনে করে। অনেকে আবার সহাবস্থানের এত শুদ্ধবাদী সংস্করণে বিশ্বাস করে, যার বাস্তব প্রয়োগ সম্ভব নয়। সহাবস্থানের সঠিক মূল্যায়ন এই সংশয় নিরসনে সহায়ক হবে।

সহাবস্থানের সাফল্য নির্ভর করে বিবেকসম্পন্ন কণ্ঠগুলোর ফলপ্রসূ সংলাপে অংশগ্রহণে আগ্রহের মাধ্যমে। এভাবেই কাজিফত ফলাফল সহজে লাভ করা সম্ভব। অন্যদিকে স্বার্থান্বেষী নির্বোধ কণ্ঠগুলো মঞ্চ দখল করে নিলে সহাবস্থানের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। শক্তি ও জোরাজুরিই হলো এই লোকগুলোর দৃষ্টিভঙ্গি আর সিদ্ধান্তের চালিকাশক্তি। সংঘাতকেই এরা মনে করে অপরের সাথে আচরণের মূল চাবিকাঠি।

পারস্পরিক মানবতা, সার্বজনীন মূল্যবোধ, আর সাধারণ প্রয়োজন ও চাহিদার দৃষ্টিকোণ থেকে তারা কোনোকিছুকে দেখতে পারে না।

যুদ্ধকামীরা যুদ্ধ ছাড়া আর কিছু ভাবতে জানে না। তাদের সকল বয়ান ঘুরেফিরে ওই একই উপসংহারে গিয়ে পৌঁছে।

কিছু লোকের ধারণা ধর্মের উদ্দেশ্যই মানুষে মানুষে সংঘাত বাঁধানো। বাস্তবতা এর বিপরীত। দ্বীনের উদ্দেশ্য হলো মানুষের পারস্পরিক আচরণকে একটি নৈতিক আকৃতি প্রদান এবং সামঞ্জস্য নিশ্চিত করা, যাতে জীবনের মানোন্নয়নে সফল সহযোগিতা সম্ভব হয়।

আল্লাহ মানবতার ব্যাপারে বলেন,

هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ

“তিনিই ভূমি হতে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, তন্মধ্যে তোমাদের বসতি দান করেছেন।” (সূরাহ হূদ ১১:৬১)

আদম আলাইহিসসালামকে সৃষ্টি করে আল্লাহ তাঁকে জমিনে বিচরণ ও আবাদ করার দায়িত্ব দেন। ফেরেশতাগণ প্রথমে মানবসৃষ্টির ব্যাপারে আপত্তি জানিয়ে বলেছিলেন,

قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ

“আপনি কি সেখানে এমন কাউকে স্থাপন করবেন, যারা সংঘাত ও রক্তপাত ঘটাবে? অথচ আমরাই তো আপনার প্রশংসা ও গুণকীর্তনে নিয়োজিত আছি।” (সূরাহ আল-বাকারাহ ২:৩০)

ফেরেশতাগণ ভালো করেই জানতেন যে, আল্লাহ সংঘাত ও রক্তপাত ঘৃণা করেন। তাহলে আল্লাহ নিশ্চয় আমাদের নিজেদের মাঝে যুদ্ধ বাঁধানোর উদ্দেশ্যে মানবজাতির সৃষ্টি ও কিতাব প্রদান করেননি।

ইসলামের বাণী প্রচারের যে দায়িত্ব মুসলিমদের উপর রয়েছে, তার জন্য প্রয়োজন অন্তর ও হৃদয়কে জয় করা। তাদের ইসলামকে ইসলামের মতো করেই জানতে হবে। মুসলিম হিসেবে আমাদের উচিত ধৈর্য ও সহনশীলতার অনুশীলন করা। কুরআনের একাধিক স্থানে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে গালমন্দের জবাবে আমাদের উত্তম কথা বলতে।

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ
عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴿٣٤﴾

“ভালো ও মন্দ সমান নয়। মন্দকে প্রতিহত করো উত্তম দিয়ে। তাহলে দেখবে তোমার সাথে যার শত্রুতা রয়েছে, সে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যাবে।” (সূরাহ ফুসসিলাত ৪১:৩৪)

এভাবেই রাসূল (ﷺ) তাঁর শত্রুদের হৃদয় জয় করেছেন। তাদের রূঢ়তা-কঠোরতার জবাবে তিনি দিয়েছেন নম্রতা। ফলে ইসলামের সত্য গ্রহণ করার জন্য তাদের অন্তর কোমল হয়ে গেছে।

কথা ও কাজে নম্র ব্যবহার, সত্যিকারের যত্ন ও বন্ধুত্ব প্রদর্শন এবং অন্যদের সাথে সদাচরণ—এগুলো হলো ঘৃণা দূর করে মানুষে মানুষে সম্প্রীতি আনার মাধ্যম। আল্লাহ বলেন,

وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٣٥﴾

“ধৈর্যশীল ও আত্মসংযমী ছাড়া আর কেউই এই কল্যাণের অধিকারী হতে পারে না। আর তারাই মহাভাগ্যবান।” (সূরাহ ফুসসিলাত ৪১: ৩৫)

সহাবস্থান মানবজীবনকে রক্ষা করে। এটি সংলাপের রাস্তা খুলে দেয়। এমন পরিবেশেই ইসলামের দাওয়াত ছড়িয়ে পড়ে। কুরআনভর্তি যুক্তি ও প্রমাণ উপস্থাপন করে তখনই ইসলাম নিজেকে তুলে ধরতে পারে।

সত্যিকারের অংশগ্রহণ

বিশ্বায়নের হুমকি ও প্রতিশ্রুতি আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। এটি এত মহাপরিবর্তনের ইঙ্গিত নিয়ে আসছে যে, আজকের মুসলিম বিশ্বের তোলপাড় ও আন্দোলনগুলোকে দোষ দেওয়া যায় না। ‘সার্বজনীনতা’ ও ‘আন্তর্জাতিকতা’র সাথে বিশ্বায়নকে গুলিয়ে ফেললে হবে না। এটি বরং অর্থনীতি, যোগাযোগ, মানবীয় মূল্যবোধ সহ সবকিছুর আকৃতি-প্রকৃতিতে এক নতুন ধরনের পরিবর্তন।

বিশ্বায়নের ক্লাবে নেতৃত্ব দিচ্ছে বিত্তশালী ও ক্ষমতাবানেরা। এ থেকে মনে হচ্ছে যে, এটি আসলে ছদ্মবেশী ‘আমেরিকায়ন’, বিশ্বশোষণ আর সাংস্কৃতিক একীভবনের হীন কৌশল।

মুসলিমরা এই ক্লাবে ঢোকার চেষ্টা করছে বটে। কিন্তু তারা বড় দুর্বল, বিভক্ত, ও অমনোযোগী। এ যেন অলিম্পিক প্রতিযোগীদের বিরুদ্ধে এক খোঁড়া ব্যক্তির ম্যারাথন প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্বপ্ন।

অনেকেই বিশ্বায়নের দিকে সতর্ক চোখ রাখছে। এর কারণও আছে। এটা নিয়ে শুধু দুশ্চিন্তা করাই যথেষ্ট নয়। বিশ্বায়নের মাধ্যমে আনীত পরিবর্তনগুলো বিপজ্জনক হতে পারে, এটা জানা থাকা ভালো। কিন্তু একইসাথে একে দেখতে হবে এমন এক চ্যালেঞ্জ হিসেবে, যেখান থেকে অনেক সুবিধা বের করে নেবার সুযোগও আছে।

কোনো নির্দিষ্ট কৃত্রিম স্যাটেলাইট বা প্রশাসনব্যবস্থা বা আইনের মধ্যে আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা যাবে না। বরং ভাবতে হবে আমরা কি শ্রোতের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রতিযোগিতা করতে আর নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণে প্রস্তুত, নাকি দূর থেকে বসে শুধু প্রতিবাদ আর অভিযোগ করাই যথেষ্ট?

এটা কি আমাদের ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রচারের মোক্ষম সুযোগ নয়? সুদমুক্ত ব্যাংকিং ও বিনিয়োগব্যবস্থা চালু করে সুদের নিষ্পেষণ দূর করার কি এখনই সময় নয়?

মিডিয়া ব্যবহার করে ইসলামের অনন্য বার্তা ছড়িয়ে দেবার এটাই কি যথার্থ সময় নয়? এভাবেই কি আমরা পারি না আমাদের যুবসমাজ ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষা করে ইসলামি অনুশাসনের সাথে পরিচয় করাতে?

আমাদের স্থবির রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থাকে উন্নত করার এখনই কি সময় নয়? এই উন্নয়ন বিজাতীয়দের দেখানো শোষণমূলক রূপরেখা অনুযায়ী হবে না। বরং ইসলামের সত্যিকারের নিরাপদ ও কল্যাণকর মহান আদর্শ অনুযায়ী হবে।

ইসলামই সবচেয়ে স্পষ্ট ও খোলাখুলিভাবে আমাদের মানবাধিকার রক্ষা করে। এটি জনগণের আস্থা ও ঐক্য নিশ্চিত করে এবং মুসলিম দেশগুলোর মাঝে সম্পর্কের শক্তি বৃদ্ধি করে আমাদের অবস্থা উন্নয়নের নির্দেশনা দেয়। ইসলামের দাবি হলো সমবায়ভাবে প্রকল্প আয়োজন করে আমাদের দেশ ও জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

আমরা ইতিহাসের এক কঠিন সময়ে দাঁড়িয়ে আছি। অথচ সমাধান বের করা ছাড়াই আমরা এ থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছি।

আমাদের একমত হতে হবে যে, অংশগ্রহণ এখন বাধ্যতামূলক হয়ে দাঁড়িয়েছে। মুসলিমদের কল্যাণকামী সকলের জন্য আমাদের অংশগ্রহণ হবে একটি মৌলিক ভিত্তি। এর অর্থ এই না যে, ব্যক্তি ধরে ধরে সকলকে অংশগ্রহণ করতে হবে। তবে অন্তত এই মূলনীতির ব্যাপারে একমত হতে হবে।

বহু বছরের প্রতিবাদ ও আন্দোলনের পরই কেবল সৌদি আরবের লোকেরা স্থানীয় মিডিয়ার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরেছে। অথচ স্যাটেলাইট টেলিভিশন চালু করার সিদ্ধান্ত তারা কত অল্প সময়ে নিয়ে নিল!

প্রতিটা ব্যাপারেই কি আমাদের উত্তপ্ত বিতর্ক করে তারপর সিদ্ধান্তে আসতে হবে?

আমাদের সামনে কোনো বিকল্প নেই। এই জিনিসগুলো হবে কি হবে না, এ ব্যাপারে আমাদের কোনো হাত নেই। আমরা এতে অংশগ্রহণ করব কি না, এতটুকু সিদ্ধান্তই আমাদের হাতে আছে। ট্রেন কিন্তু ছেড়ে দিচ্ছে। উঠতে চাইলে এখনই উঠতে হবে।

প্রশ্ন আর আপত্তি তো অসংখ্যবার তোলা যায়। শেষমেশ অনেক দেরিতে গিয়ে দেখা যায় অংশগ্রহণই সঠিক সিদ্ধান্ত ছিল।

কিছু মানুষ অন্তত এই কাজের পরিসরে বাস্তবেই অংশ নিক। সকলের অংশ নেয়া জরুরি না। তবে অন্তত অংশগ্রহণের বাস্তবতার ব্যাপারে সকলে একমত হই।

অংশগ্রহণের অর্থ আত্মসমর্পণ বা আত্মপরিচয় হারানো নয়। এর অর্থ হলো চারপাশে ব্যবহৃত হতে থাকা হাতিয়ার ও মাধ্যমগুলো দিয়ে ইসলামি কার্যক্রমের সূচনা। কোনো জিনিসকে ভুল বা আপত্তিকর বলে ঘোষণা করাটাই ইসলামের শিক্ষা নয়। ইসলামের আসল শিক্ষা হলো ভুলকে যথাসাধ্য সংশোধন করা। নবিজি (ﷺ) এর মাক্কি ও মাদানি উভয় জীবনই এর সাক্ষ্য বহন করে।

ভবিষ্যতের সুরক্ষা ও বর্তমানের নিরাপত্তার জন্য মুসলিম বিশ্বের সম্পদ ও অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাগুলোর যথাসম্ভব ব্যবহার শুরু করতে হবে।

গণমাধ্যম, সংলাপ, শিক্ষা, রাজনীতি, নির্বাচন, সংগঠন...এই সব জায়গায় মানুষ জড়িত হতে পারে। সামনে কেবল দুটো বিকল্প। একটি হলো নেতিবাচক মনোভাব নিয়ে জায়গায় বসে থাকা এবং কোনো প্রভাব ফেলতে না পারা। আরেকটি হলো সরাসরি যুক্ত হয়ে নিয়ন্ত্রকের আসনে ভাগ বসানো। বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষ ও পারদর্শী মুসলিমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে অংশ নেবে। স্বার্থসিদ্ধি বা খ্যাতির লোভে নয়, ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি সত্যিকার দরদের কারণে নিষ্ঠার সাথে এ কাজগুলো করতে হবে। উপরন্তু এই অংশগ্রহণকারীদের দৃষ্টিভঙ্গি হতে হবে প্রশস্ত; দলান্ব নয়।

আমার ব্যক্তিগত মত হলো, এই ধরনের সত্যিকারের অংশগ্রহণ অত্যাশঙ্ক। অন্যের মতকে দমন করে এটি আসতে পারবে না। বরং পারস্পরিক বোঝাপড়া আর সহযোগিতার অনুকূল একটি পরিবেশ সৃষ্টি করলেই তা সম্ভব। অন্যের মতকে কখনওই চিরতরে দমিয়ে রাখা যায় না।

নিষ্ঠা এবং সততা থাকলে আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটবর্তী। আমরা তাঁর কাছেই আমাদের সকল আশা প্রত্যর্পণ করি।

সকল নবির সুন্নাহ

একবার রমজান মাসে মসজিদুল হারামে এক যুবকের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি উমরাহ করতে এসেছিলেন। তাঁর মাথায় ছিল সাদা পাগড়ি আর কাঁধ পর্যন্ত বাবড়ি চুল। পরনের জোব্বা ছিল পায়ের গোছার অর্ধেক পর্যন্ত লম্বা। জোব্বার উপর কালো রঙের চাদরের মতো একটি পোশাক ছিল। রমজানের এই ভিড়েও মক্কায় তাকে আলাদা করে চোখে পড়ছিল।

তিনি আমার পাশে বসা অবস্থায় আমি তাকে তার বেশভূষার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন যে, তিনি নবিজি (ﷺ)-এর সুন্নাহ অনুসরণ করছেন।

আমি এই সুযোগে তাকে জানিয়ে দিলাম যে, পাগড়ি পরা সুন্নাহ নয়। প্রাক-ইসলামি যুগ থেকেই এটি একটি আরব সাংস্কৃতিক পোশাক। নবিজি (ﷺ) এটা পরতেন, কারণ এটাই তাঁর এলাকার প্রথা। এটা যেমন ধর্মীয় বিধান নয়, তেমনি হারামও নয়। পাগড়ির ব্যাপারে কোনো সহিহ হাদিস নেই। এটা এমনি সাংস্কৃতিক বা প্রথাগত বিষয়।

তারপর ব্যাখ্যা করে দিলাম যে, চুলের দৈর্ঘ্যের ব্যাপারে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ফাতওয়াও এই যে, এটাও প্রথার উপর নির্ভরশীল। নবিজি (ﷺ)-এর চুলের দৈর্ঘ্য ইবাদাত সংক্রান্ত কোনো সুন্নাহ নয়। সুন্নাহ হলো যেটার ব্যাপারে নবিজি (ﷺ) আমাদের আদেশ করেছেন। আর তা হলো চুল পরিপাটি রাখা। চুলের দৈর্ঘ্য তেমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়।

তারপর বললাম, “আপনি উমরাহ করছেন। উমরাহর সময় পুরুষের মাথা কামানো যে সুন্নাহ, এ ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই। নবিজি (ﷺ) আল্লাহর কাছে তিনবার এই বলে দুআ করেছেন, ‘হে আল্লাহ! তাদের ক্ষমা করে দিন, যারা মাথামুণ্ডন করেছে...।’ তারপর মাত্র একবার বলেছেন, ‘...আর যারা চুল কেটেছে।’ এত স্পষ্ট একটি সুন্নাহ আপনি ত্যাগ করলেন কেন?”

সবশেষে আমি তাকে এই উপদেশ দিলাম, “আপনার সত্যিকার নিয়তের ব্যাপারে সতর্ক হোন। বিশেষত নিজেকে আলাদাভাবে উপস্থাপন করে অন্যের মনোযোগ

আকর্ষণ করার ক্ষেত্রে। আলিমদের মতপার্থক্যপূর্ণ কোনো বিষয়ে নির্দিষ্ট ধরনের বাহ্যিক আচরণ করে মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করবেন না। এটা শয়তানের একটা সূক্ষ্ম চাল। মনে রাখবেন, নবিজি (ﷺ) আমাদের এমন পোশাক পরতে নিষেধ করেছেন, যা অযথা মনোযোগ আকর্ষণ করে।”

এই সুন্নাহর কথাই যুবক ভাইটি বেমালুম ভুলে ছিলেন।[৩৮]

সুন্নাহর ভুল ব্যাখ্যার এটা একটা উদাহরণ, যার কারণে মানুষ গুরুত্বপূর্ণ ও আসল বিষয়গুলো বাদ দিয়ে প্রথা ও অভ্যাসগত বিষয়ে অপ্রয়োজনীয় গুরুত্ব দিয়ে বসে।

মানুষকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়ে পরীক্ষা করার জন্য সুন্নাহ আসেনি। মানুষের সাধ্যের বাইরের নিয়মনীতি আর তাত্ত্বিক অনুমান চাপিয়ে দেওয়া সুন্নাহর কাজ নয়। অন্য কিছু হলে খেয়ালই করত না, এরকম ব্যাপারে মানুষ যেন সুন্নাহ ভেবে অতিরিক্ত পেরেশান না হয়ে পড়ে। আর এসব ব্যাপারে এত আবেগী আচরণ করার ফলে যদি ইসলামি শরিয়তের সীমা লঙ্ঘিত হয়, তাহলে তা আরো খারাপ। যেমন- মানুষের অধিকার হরণ বা তাদের সাথে খারাপ আচরণ করা। অপ্রয়োজনীয় ব্যাপারগুলো যেন আমাদের ঐক্য ও ঈমানের পরিচর্যার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ব্যাঘাত না ঘটায়।

নবি (ﷺ) এর সুন্নাহ খুবই মহান ও গভীর। ইবাদাতের খুঁটিনাটি সুন্নাহর অংশ হলেও শুধু এগুলোই সুন্নাহ নয়। এর পরিসর আরো বড় এবং প্রাসঙ্গিকতা আরো সাধারণ। নবুওয়াতের বার্তার উদ্দেশ্য যেসব মহান ধ্যান-ধারণার মাধ্যমে প্রকাশ পায়, সে সবই সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ আমাদের যে মহান উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন, তা পূর্ণ করার জন্য সুন্নাহ একটি মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। আল্লাহ বলেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

[৩৮] পাঠক যেন এখান থেকে এমন কোনো সিদ্ধান্তে না পৌঁছেন যে, মাথায় টুপি বা পাগড়ি বাধা, লম্বা চুল রাখা (যেভাবে রাসূল (ﷺ) এর ছিল) এসব করতে এখানে নিষেধ করা হচ্ছে। এমনটা নয়। শাইখ আওদাহ মূলত যুবক ভাইটির মূল সুন্নাহ ছেড়ে দিয়ে অন্য বিষয়ে সিরিয়াস হওয়ার উদাহরণ টেনেছেন। মাথায় পাগড়ি পরা, লম্বা চুল রাখতে রাসূল (ﷺ) সরাসরি কোথাও না বললেও, এসব রাসূলের প্র্যাকটিস ছিল। আমাদের জানামতে শাইখ আওদাহ নিজেও মাথায় টুপি পরেন। তাই মাথায় টুপি/পাগড়ি পরা সুন্নাহ কি না, কেমন সুন্নাহ এসব বিতর্কে যাওয়া এখানে উদ্দেশ্য নয়, যারা এসব করেন নিঃসন্দেহে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এর প্রতি ভালোবাসা থেকেই করেন। এখানে কোথাও সেই আমলকে নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে না।— সাজিদ ইসলাম

“নিশ্চয় আমি জিন ও মানবজাতিকে শুধুমাত্র আমার ইবাদাত করার জন্য সৃষ্টি করেছি।” (সূরাহ আয-যারিয়াত ৫১:৫৬)

সুন্নাহর উদ্দেশ্য হলো মানুষ যেন তার ঈমানের অর্থ তুলে ধরে, নেক আমলে এগিয়ে যায়, আর নিজেদের আচরণ সুন্দর করে। দ্বীনের খুঁটিগুলো (ঈমান, সালাত, যাকাত, রোজা, হজ্জ) কীভাবে পালন করতে হবে, তাও সুন্নাহ ব্যাখ্যা করে দেয়।

এ কারণেই আগেকার নবিগণের ব্যাপারে বলার সময় আল্লাহ তাঁদের সবচেয়ে বড় সুন্নাহর কথাই আমাদের জানান। আল্লাহ বলেন,

وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ﴿٧٣﴾

“আর তাদেরকে আমি নেতা বানিয়েছিলাম। তারা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে সঠিক পথ দেখাত। আমি তাদের প্রতি সৎকাজ করার, সালাত কায়েম করার এবং যাকাত প্রদান করার জন্য ওহী প্রেরণ করেছিলাম। আর তাঁরা আমারই ইবাদাত করত।” (সূরাহ আল-আম্বিয়া ২১:৭৩)

এই লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়নেই নবিগণ কঠোর পরিশ্রম করেছেন। আলাইহিসসালাম। তাঁদের মিশন ও বার্তার মূল নির্যাস এটিই। কুরআনে আল্লাহ যে সুন্নাহর কথা বলেছেন এবং হাদিসে রাসূল (ﷺ) যা ব্যাখ্যা করেছেন, সেগুলোর ভিত্তি এটিই।

একটি হাদিসে জিবরিল আলাইহিসসালামের সাথে নবিজি (ﷺ) ইসলাম, ঈমান ও ইহসান নিয়ে কথা বলেন। সেখানেও আমরা এ কথাই দেখতে পাই। নবিজি (ﷺ) যেভাবে ইসলামি মূলনীতিগুলো প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়ন করেছেন এবং নেক আমলগুলো যেভাবে করেছেন, তাতেও আমরা একই জিনিস দেখতে পাই। ইয়াকিন, নশ্রতা, অন্তরের ইবাদাত, চারিত্রিক উৎকর্ষ, আল্লাহর ইবাদাতে মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ করার মাধ্যমে যেভাবে তিনি ঈমানের প্রতিরক্ষা করেছেন, তাতেও একই কথা দেখতে পাই।

মানুষের মাঝে অস্থিরতা বা বিভক্তি আনার চেষ্টা কখনও তিনি করেননি। তাদের মাঝে দয়াশীলতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি কোনো আপোস করেননি।

নবিজি (ﷺ) তাঁর অনুসারীদের আদেশ করেছেন,

وَبَشِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا

“মানুষকে সুসংবাদ দাও। দূরে সরিয়ে দিও না।” [৩৯]

এগুলোই সুন্নাহর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক। সুন্নাহর মাঝে কি আমরা নৈতিকতা ও দয়ার কোনো লঙ্ঘন দেখতে পাই? এগুলোই আল্লাহর বাণীর মৌলিক উদ্দেশ্য। সুন্নাহর মাঝে আমরা অসহিষ্ণুতা ও ঘণার কোনো চাষাবাদ দেখি না। বরং এতে দেখি মহানুভবতা ও সুসংবাদ পৌঁছে দেবার প্রতিটি সুযোগের সদ্ব্যবহার।

নববি সুন্নাহর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয় আমাদের পুনর্জীবিত করা দরকার, তা হলো ধৈর্য ও ঈমানের দৃঢ়তা। যেমন- তিনি মানুষকে যেভাবে ধাপে ধাপে ইসলামের শিক্ষা দিয়েছেন, বিশেষত মাক্কি যুগে। এভাবে কাজ করতে ধৈর্য প্রয়োজন। আল্লাহ সকল নবিকেই ধৈর্যশীল বলে পরিচয় দিয়েছেন,

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴿٢٤﴾

“আর আমি তাদের মধ্য থেকে বহু নেতা করেছিলাম। তারা আমার আদেশানুযায়ী সৎপথ প্রদর্শন করত। কারণ তারা ধৈর্যধারণ করেছিল আর আমার আয়াতসমূহের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখত।” (সূরাহ আস-সাজদাহ ৩২:২৪)

এ আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, দ্বীনি ব্যাপারে নেতৃত্ব লাভ করা যায় ধৈর্য ও ইয়াকীনের মাধ্যমে।

মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করার পর নবিজি (ﷺ) সময় নিয়ে একটি সমাজ গড়ে তুলেছেন। এখানে তাঁর অসাধারণ দূরদৃষ্টি ও পরিকল্পনা দেখা যায়। মানুষকে মানিয়ে নেবার সময় না দিয়ে রাতারাতি কোনো পরিবর্তন নিয়ে আসার মতো অধৈর্য তিনি ছিলেন না। কিছু পদক্ষেপ দেখে অবস্থার অবনতি মনে হচ্ছিল। কিন্তু নবি (ﷺ) ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন কেন সেগুলোর দরকার ছিল।

এর একটি সুন্দর উদাহরণ হলো হুদাইবিয়ার চুক্তি। নবিজি (ﷺ) সে বছর হজ্জ না করে ফিরে যেতে এবং খুবই একপাক্ষিক একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে সম্মত হন। বেশিরভাগ সাহাবি একে মুসলিমদের জন্য পরাজয় ভেবে নিয়েছিলেন। কিন্তু

নবিজি (ﷺ) বুঝেছিলেন যে, এটি ইসলামের বিশাল একটি অর্জন। কুরআনে একে ‘বিজয়’ বলে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহ বলেন,

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ﴿١﴾

“নিশ্চয় আমি আপনাকে দান করেছি এক স্পষ্ট বিজয়।” (সূরাহ আল-ফাতহ ৪৮:১)

এই চুক্তির ফলে আরব গোত্রগুলো মুসলিমদের সাথে সন্ধি করার স্বাধীনতা পায়। এভাবে অনেকে ইসলামে প্রবেশ করে। নবি (ﷺ) এই পরিস্থিতিগুলো ধৈর্যশীল ও চিন্তাশীল দৃষ্টিতে দেখেছেন। বৃহত্তর চিত্রের কথা মাথায় রেখে লক্ষ্য অর্জনে সুচিন্তিত পদক্ষেপ নিয়েছেন।

আরেকটি হারিয়ে যাওয়া সুন্নাহ হলো অন্যের অনুভূতি ও সংবেদনশীলতার ব্যাপারে সচেতনতা। নবিজি (ﷺ) জানতেন মানুষের সাথে কীভাবে সম্পর্ক গড়তে হয়। তিনি সকলের প্রতি দয়া ও প্রাপ্য সম্মান দেখাতেন।

এছাড়াও তিনি অতীতের ভুল ক্ষমা করে দিতেন। এর ফলে অতীতের শত্রুভাবাপন্ন অনেক মানুষ পরে সহজে তাঁর কাছে আসতে পেরেছে। নববি সুন্নাহর এই দিকটিকে আজকের অনেক দাঁই উপেক্ষা করে যান। নবিজি (ﷺ)-এর বার্তা যারা প্রত্যাখ্যান করত, তাদের সাথে তিনি সেতু গড়ে তুলতেন। খোলাখুলি শত্রুতা করা মানুষদের জন্যও তিনি ইতিবাচক সাড়া দেওয়ার একটি দরজা খোলা রাখতেন। অতীতে শত্রুতা করা কেউ যদি পরে ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে তাঁর কাছে আসত, তাহলে তিনি তাদের আগের ভুলের কথা বলে খোঁচাতেন না। বরং এমন আচরণ করতেন, যাতে তারা অতীতের কথা ভুলে যায়। এর সবচেয়ে নজরকাড়া উদাহরণ হলো মক্কাবিজয়ের পর তাঁর ঘোষণা: “যাও, তোমরা মুক্ত।”

এছাড়াও নবি মৃত মুশরিক ও কাফিরদের উপহাস করতে কিংবা অপমান করতে নিষেধ করে গেছেন। এর একটি কারণ হলো জীবিত কাফির-মুশরিকদের অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধা। তিনি বলেন,

لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَتُؤْذُوا الْأَحْيَاءَ

“মৃত ব্যক্তিদেরকে তোমরা গালি দিও না, (যদি দাও) তাহলে জীবিতদেরই কষ্ট দিলে।” [৪০]

সকল নবিই বুঝাতেন যে, তাঁরা মানুষের পথপ্রদর্শক। তাঁরা এসেছিলেন মানুষকে সাহায্য করতে। কাঠিন্য, মন্দ কাজ ও অশান্তি দূর করতে। আল্লাহ তাঁদের আগুনে ঘি ঢালতে পাঠাননি। সত্যকে আলিঙ্গন করা কঠিন করে তুলতে আসেননি। কারো কাছে তাঁরা কোনো প্রতিদান চাননি, কেবলই পথ দেখাতে চেয়েছেন।

আল্লাহ তাঁদের বর্ণনায় বলেন,

أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ أَقْتَدِهٖ ۖ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنِّ هُوَ الْ

ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ ﴿٩٠﴾

“এদেরকেই আল্লাহ পথ প্রদর্শন করেছেন। অতএব, তাদের হিদায়াত থেকে শিক্ষা নাও। বলো, ‘আমি এই বার্তার বিনিময়ে কোনো পারিশ্রমিক চাই না। বরং এটি তো সৃষ্টিজগতের প্রতি উপদেশ।’” (সূরাহ আল-আন’আম ৬:৯০)

ব্যক্তিগত দায়িত্ব

ব্যক্তি—সমাজেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। একইসাথে ইসলামি জীবনধারার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আসলে পুনরুত্থান ও শেষবিচারের ভিত্তিই হলো ব্যক্তিগত দায়িত্বের বাস্তবতা। আমা দেব সৃষ্টির ব্যাপারেও একই কথা বলা যায়। আমরা একেকজন অনন্য ব্যক্তি হিসেবে সৃষ্ট হয়েছি। আল্লাহ বলেন,

﴿١١﴾ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا

“যাকে আমি অনন্য করে সৃষ্টি করেছি, তার ব্যাপারে আমিই ব্যবস্থা নেব।”

(সূরাহ আল-মুদাসসির ৭৪:১১)

পরকালে নিজ নিজ সম্পদ, পরিবার, দল বা স্বদেশীর সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে হাশরের মাঠে পুনরুত্থানের আশা করা যায় না। বাস্তবতা হলো, নিকটতম মানুষটিও সেদিন আপনাকে পরিত্যাগ করবে।

আল্লাহ বলেন,

وَمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿٣٤﴾ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ﴿٣٥﴾ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ﴿٣٦﴾ لِكُلِّ

أَمْرٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴿٣٧﴾

“সেদিন মানুষ পালিয়ে বেড়াবে তার ভাইয়ের কাছ থেকে, মা ও বাবার কাছ থেকে, সঙ্গী ও সন্তানের কাছ থেকে। সেদিন প্রত্যেকের নিজের গুরুতর অবস্থাই তাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে।” (সূরাহ আল-আবাসা

৮০:৩৪-৩৭)

ইতিকাহের একটি হিকমাহ হলো ব্যক্তিগত দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা ফিরিয়ে আনা। কারণ যেসব সামাজিক ও দলগত টান আমাদের চিন্তাচেতনাকে আচ্ছন্ন করে রাখে, ইতিকাহ আমাদের তা থেকে মুক্ত করে আনে। একাকী একজন ব্যক্তি হিসেবে মসজিদে আশ্রয় নিয়ে আমরা আমাদের স্বাভাবিক মানসিক স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করি।

মানুষ চেষ্টামেটি করে, ধাক্কাধাক্কি করে, নানা কাজে ব্যস্ত থাকে। এ কারণেই আল্লাহ আমাদের একা হতে নির্দেশনা দেন:

قُلْ إِنَّمَا أَعْطُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلَ ثَمْنٍ وَفِرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا

“বলো, ‘আমি তোমাদেরকে একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি, তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে দু’জন অথবা এক একজন করে দাঁড়িয়ে যাও। অতঃপর ভাবনাচিন্তা করো।” (সূরাহ সাবা ৩৪:৪৬)

অন্যের মতকে তার প্রাপ্য সম্মান অবশ্যই দিতে হবে। কেউ আমাদের সাথে একমত হবে, কেউ হবে না। তবে তাদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা সুরক্ষায় আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। কিন্তু ইসলাম আমাদের যে স্বচ্ছ চিন্তাভাবনার দিকে ডাকে তা হলো, মানুষের খেয়ালখুশির অনুসরণ ত্যাগ করা।

সাধারণভাবে মানবজাতি যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়, ব্যক্তিগতভাবেও প্রত্যেকে সেসব সমস্যা মোকাবেলা করে। মুসলিম উম্মাহর সামনে আজ যেসব সমস্যা বিদ্যমান, ব্যক্তি মুসলিমের সামনেও তার বেশিরভাগ সমস্যা বিদ্যমান। ইসলাম যে ধরনের আত্মসচেতনতা অর্জনের আদেশ দেয়, তা অর্জন না করেই সমস্যার মুখোমুখি হলে মানুষ সহজেই অন্য কিছুর উপর দোষ চাপিয়ে দিতে পারে। এই জায়গাতে এসেই মানুষ বিশ্বায়ন, জায়নবাদ, গোপন ষড়যন্ত্র ইত্যাদির ঘাড়ে দোষ চাপায়। সরকার, আলিমসমাজ, তাকদীর, ইতিহাস কোনোকিছুই দোষারোপের হাত থেকে মুক্তি পায় না।

নিজের দোষ কখনো এরা দেখবে না। নিজের আদালতে তারা স্বভাবতই বেকসুর খালাস। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি, তাদের মত, সব সঠিক। তারাই সব জানে। সবাই যদি বুদ্ধি করে তাদের অনুসরণ করত, তাহলেই তো দুনিয়ার সব সমস্যা সমাধান হয়ে যায়!

এই মানুষগুলোই দেখবেন তাদের ঘরের ভেতরের সমস্যাগুলো সমাধানেও অপারগ। দুই আর দুই মিলিয়ে চারের সমাধান তারা বের করতে জানে না। এরা হতে পারে অনভিজ্ঞ, অপ্রশিক্ষিত, সিদ্ধান্তহীন। হতে পারে নিজের বদভ্যাস ও চরিত্রের ত্রুটি কাটিয়ে উঠতে অপারগ।

নতুন নতুন দীন মানতে শুরু করা অল্পবয়সীদের মাঝে এই প্রবণতা খুব বেশি দেখা যায়। এদের মাঝে অনেকেরই ধারণা সব সমস্যা সমাধানের চাবি তাদেরই হাতে। ঈসা আলাইহিসসালামের মতোই যেন তারা আল্লাহর আদেশে শ্বেতরোগীকে সুস্থ করতে পারে, অন্ধকে চক্ষুস্থান করতে পারে, মৃতকে জীবিত করতে পারে।

কুরআন-সুন্নাহ যেন তারা একাই বোঝে। অন্যের অজ্ঞতা ও পথভ্রষ্টতাকে দায়ী করা এদের কাছে কত যে সহজ!

এই ব্যক্তিগত ব্যর্থতা মুসলিম উম্মাহর সার্বিক সমস্যা আরো গুরুতর করেছে। সমাধানে এর কোনো ভূমিকা নেই।

কোনো ব্যক্তির জ্ঞান, দক্ষতা ও সামাজিক অবস্থানের গুরুত্বের ভিত্তিতে তার ব্যক্তিগত দায়িত্ব বিভিন্নরকম হয়। এই দায়িত্ব রাতারাতি গজিয়ে ওঠে না। এটি একটি ঐতিহাসিক প্রসঙ্গের ভেতরে অবস্থান করে। দায়িত্ব মানে বোঝা বইতে জানা, কর্তব্য-অধিকার ঠিক রাখা, যা কিছু ঠিক তা তা করা।

সংজ্ঞা মতে যদিও ব্যক্তিগত দায়িত্বের মূল আলোচ্য ব্যক্তি নিজে, তারপরও এর কল্যাণ পুরো সমাজই লাভ করে। নবিজি (ﷺ) বলেন,

كُلُّ سَلَامَةٍ مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ - قَالَ - تَعْدِلُ
بَيْنَ الْإِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي ذَاتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَنَاعَهُ
صَدَقَةٌ - قَالَ - وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ وَكُلُّ خَطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ
وَتَمْشِي طُرُقَ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ

“প্রতিদিন শরীরের প্রতিটি জোড়ার উপর সদকার দায়িত্ব আসে। বিবাদমান দুই ব্যক্তির মাঝে মীমাংসা করা সদকা। কাউকে তার বাহনে চড়তে সাহায্য করা সদকা। তার কাছে তার মালপত্র তুলে দেওয়া সদকা। ভালো কথা বলা সদকা। সালাতের দিকে যেতে প্রতিটি পদক্ষেপ সদকা। রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানো সদকা।”[৪১]

কিছু না পারলেও রাগের সময় নিজেকে সংবরণ করাও সদকা।

ব্যক্তিগত যেসব ফরজ ইবাদাতের কথা ফিকহের প্রামাণ্য গ্রন্থাদিতে বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো ব্যক্তিগত দায়িত্বেরই অন্তর্ভুক্ত। এই সব দায়িত্বগুলো দেওয়া হয়েছে ব্যক্তির ইসলামি চরিত্র উন্নয়নের উদ্দেশ্যে। এর ফলে সে সমাজে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারবে।

তারপরও আমরা দেখি ব্যক্তিগত ক্রটিব্যাচ্যুতি কাটিয়ে না উঠেই অনেক মুসলিম বৈশ্বিক সমস্যা নিয়ে সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকে। মুসলিম বিশ্বের দুর্দশা নিয়ে চিন্তিত থাকে

অথচ নিজের দেশের সমস্যা চোখ এড়িয়ে যায়। মানবজাতির অবস্থা নিয়ে মাতম করে অথচ নিজেরাই অজ্ঞতা, অলসতা ও ঈমানি দুর্বলতার মাধ্যমে নিজেদের উপর জুলুম করে।

অন্যের সম্পদ দখল, অশ্লীলতায় লিপ্ত হওয়া, গীবত ও অপবাদ প্রদান, স্বার্থচিন্তা ইত্যাদি সমস্যায় যদি ব্যক্তি হিসেবেই আমরা ডুবে থাকি, তাহলে মুসলিম উম্মাহর সার্বিক সমস্যা নিয়ে আমরা কীভাবে কথা বলতে পারি? আমরা এমন হলে তো আমরা নিজেরাই সমস্যার অংশ।

তাই বিশ্বের সমস্যা সমাধান করার প্রথম ধাপ হলো নিজের ত্রুটিগুলো সংশোধন করা। সমাজসংস্কারের মহাসড়কে যাত্রার প্রথম পদক্ষেপ হলো আত্মসংস্কার। পৃথিবীর সমস্যা নিয়ে আমরা এত ব্যস্ত যে, আত্মার সমস্যার দিকে আমরা তাকাই না। আত্মোন্নয়নের ও চিন্তাপদ্ধতি উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ কাজ আমরা ফেলে রাখি। অথচ সার্বজনীন সমস্যা সমাধানে এগুলোর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব আছে। ব্যক্তি নিয়েই তো সংগঠন, প্রতিষ্ঠান আর জাতি। ইতিহাসে নাম লেখা না থাকলেও সকল ব্যক্তিরই ক্ষমতা আছে পরিবর্তন আনার পথে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার।

ইসলামের শুরুর যুগের ব্যাপক প্রসারের পেছনে শুধু ইতিহাসের পাতায় আসা নামগুলোর একার অবদান নেই। যারা যারা কষ্ট সহ্য করেছেন, সংগ্রাম করেছেন, এমনকি জীবন দিয়েছেন; যেসব নারী তাঁদের সহযোগিতা করে গেছেন, কষ্ট সয়েছেন; সকলকেই স্মরণ করতে হবে।

ইসলামি সভ্যতা বিনির্মাণের কৃতিত্ব শুধু খলিফা আর সুলতানদেরই নয়। শ্রমিক, মিস্ত্রি, চিন্তাবিদ, পরিকল্পনাবিদ, বিনিয়োগকারী সকলেরই অবদান আছে; ইতিহাস তাঁদের মনে রাখুক বা না রাখুক।

কুরআন ও ইসলামি চিন্তাধারার শিক্ষায় ব্যক্তিগত দায়িত্বের ধারণা ওতপ্রোতভাবে গেঁথে আছে। সমাজ বিনির্মাণে এটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। প্রতিটি দালান তৈরি হয়েছে অনেকগুলো ইট দিয়ে।

নবিজি (ﷺ) বলেন, “মুমিনদের পারস্পরিক সম্পর্ক একটি দালানের মতো। প্রত্যেকে পুরো কাঠামোকে অবলম্বন দান করছে।” (সহিহ আল-বুখারি এবং সহিহ মুসলিম)

মনে রবে কি না রবে আমরা?

পরবর্তী প্রজন্ম তাকে কীভাবে মনে রাখবে, এ নিয়ে মানুষ বড় চিন্তিত থাকে। ধনকুবেররা এজন্যেই নিজের নামে বিরাট বিরাট মিনার আর সৌধ বানিয়ে যায়। ফিরআউনের বহুকাল আগ থেকেই ইতিহাসে এ ধারা চলে আসছে।

ইসলাম এসব কাজকর্ম ভালো চোখে দেখে না। ইসলাম শেখায় যে, সকলের কবর একইরকম হবে। কোনো কবর উঁচু করা যাবে না বা সাজানো যাবে না। কারো কবরের উপর সমাধিস্তম্ভ বা সৌধ হবে না।

তারপরও আমরা সবাইই তো চাই ভালো কিছু জন্ম স্বরণীয় হয়ে থাকতে। এই ইচ্ছার তাড়নায় আমরা কিছু অর্জন করতে চাই। এই ইচ্ছা একেবারেই স্বাভাবিক। এতে কোনো দোষ নেই। খাদ্য, যৌনতা ও সম্পদের মতোই এটিও আমাদের স্বাভাবিক ক্ষুধা। বাকিগুলোর মতো এটিকেও সীমার মাঝে রাখতে হবে, যেন এগুলো কোনো অপকারের কারণ না হয়।

আমি চলে যাবার পর মানুষ আমার ব্যাপারে কী ভাববে, তা নিয়ে আমার মনেও ভাবনা আসে। স্বীকার করতে দোষ নেই। প্রতিটি মানুষই কখনো না কখনো নিজেকে এ প্রশ্ন করে। আমাদের পূর্বপুরুষগণও জীবিত থাকতে এসব ভেবেছেন, কোনো সন্দেহ নেই। পৃথিবীতে তারা নিজের চিহ্ন রেখে চলে গেছেন, বেশিরভাগের চিহ্নই টিকে থাকেনি। কীসে আমাদের মানুষে পরিণত করে, এ প্রশ্নেরই অংশ এটি। আমাদের স্বভাবের মধ্যেই এমন কিছু একটা আছে, যা আমাদের ভাবতে বাধ্য করে মানুষ আমাদের মৃত্যুর পর আমাদের নিয়ে কী ভাববে।

আমাদের মাঝে বেশিরভাগ মানুষই খুব অল্পসংখ্যক মানুষের কাছে স্বরণীয় থেকে মারা যাবে। যেমন- পরিবার, বন্ধু, সহকর্মী। তাদের মাঝে কেউ হয়তো আপনার নামে ছোট একটি প্রবন্ধ লিখে পত্রিকায় বা অনলাইনে প্রকাশ করবে। খুব অল্প মানুষের নামই বিভিন্ন কারণে ইতিহাস বইয়ে বা এনসাইক্লোপিডিয়ার গ্রন্থপঞ্জিতে ঠাঁই পাবে। এক্ষেত্রে আপনার নাম জড়িয়ে থাকবে আপনার অর্জনের সাথে।

লেখক যদি চান বা জীবিতরা উৎসাহ পাবে বলে মনে করেন, তাহলে হয়তো আপনার নামের সাথে কিছু প্রশংসাবাক্যও জুড়ে দেবেন।

প্রথমবার আপনার নাম জানতে পারা পাঠকরা চিন্তা করবে তথ্যগুলো কতটুকু সঠিক। লেখক কি যথাযথভাবে আপনার ব্যাপারে লিখেছে, না রঙ চড়িয়েছে? লেখক আরেকটু আগ্রহী হলে আপনার জীবন ও অর্জনের আরো কিছু খুঁটিনাটি হয়তো থাকবে আপনার জীবনীগ্রন্থে। পাঠক ভাবতে বাধ্য হবে যে, আসলেই আপনি বলার মতো কিছু করে গেছেন। কিন্তু সত্য হলো, যাদের জীবনী এত ভালোভাবে সংরক্ষিত হয়নি বা একেবারেই বিস্মৃত হয়ে গেছে, তারাও একই পরিমাণ অনন্য ছিল।

জীবন চলবে জীবনের মতো। পৃথিবী ঘুরতে থাকবে। মানুষ তার কাজ করে যাবে। আপনার বা আমার অনুপস্থিতি একসময় কারো কোনো চিন্তারই কারণ হবে না। বরং কারো জন্য সুযোগ আসবে পৃথিবীতে আমাদের ফেলে যাওয়া খালি জায়গাটি দখল করার। তারপর নিজেদের সুযোগ-সুবিধামতো তারা নিজ নিজ মেধা ও সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করতে থাকবে।

মৃত্যুর অনিবার্যতা আমাদের আরো কঠোর পরিশ্রমী বানানোর কথা। গঠনমূলক কিছু করতে, দক্ষতা বাড়াতে, বিশ্বে আমাদের অবদান বাড়াতে প্রচণ্ড চেষ্টা করে যেতে হবে। সুনিশ্চিত প্রস্থান যেন আমাদের হতাশ বা অবসন্ন না করে দেয়। মৃত্যুর জন্য তাড়াহুড়াও করা যাবে না।

আমাদের দীন আমাদের জীবনভর পরিশ্রম করতে শেখায়। আল্লাহ বলেন,

وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴿٩٩﴾

“তোমার প্রতিপালকের ইবাদাত করতে থাকো, যতক্ষণ না সুনিশ্চিত বিষয়টি চলে আসে।” (সূরাহ আল-হিজর ১৫:৯৯)

বিখ্যাত তাবিয়ি আমর বিন মায়মুন নবিজি (ؓ) থেকে বর্ণনা করেন,

“পাঁচটি জিনিসের আগেই পাঁচটি জিনিসের সদ্ব্যবহার করো। বার্ধক্যের আগে যৌবন, অসুস্থতার আগে সুস্থতা, দারিদ্র্যের আগে সচ্ছলতা, ব্যস্ততার আগে অবসর, এবং মৃত্যুর আগে জীবন।”^[৪২]

[৪২] মুস্তাদরাক আল-হাকিম: ৩/৩০৬

নবি (ﷺ) বলেন, “এই পৃথিবীতে মুসাফিরের মতো থাকো।”

নবিজির কাছে এই উপদেশ শোনা ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এ ব্যাপারে নিজের উপলব্ধি বলেন, “এর অর্থ সকাল দেখার আশা না করে রাতে ঘুমোতে যাওয়া, রাত দেখার আশা না করে সকালে ঘুম থেকে ওঠা। কিন্তু সেইসাথে স্বাস্থ্য ও জীবন থাকতে থাকতেই এগুলোর পূর্ণ সদ্যবহার করা।”

আমাদের চিরবিদায় আমাদের পরবর্তী প্রজন্মগুলোর জন্য সুযোগ। তারা নিজেদের মতো করে পৃথিবীতে অবদান রাখার সুযোগ পায়। সুমহান আল্লাহ, যিনি আমাদের ক্ষণস্থায়ী জীবন দান করেছেন, তিনি নিজে চিরস্থায়ী। যিনি প্রজন্মের পর প্রজন্ম আর যুগের পর যুগ নিয়ে আসেন।

শান্তসৌম্য

একটি পুরনো প্রবাদ আছে, “মহাসাগর যত শান্ত, তত গভীর।” আরেকটি এরকম, “খালি কলসি বাজে বেশি।” দুটির সারকথা একই। শান্ত থাকা একটি গুণ। এর সত্যতা নিয়ে কোনো মতভেদ নেই।

চরপাশ শান্ত ও নীরব থাকলে মানবমন সবচেয়ে ভালোভাবে কাজ করতে পারে। তেমনি চিন্তাবিদেদের মেজাজ ঠাণ্ডা থাকলে চিন্তা ভালোমতো করা যায়। বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ তোলপাড়ে টালমাটাল থাকলেই এটি হঠকারি ও বেপরোয়া হয়ে ওঠে। তাই প্রতিপক্ষকে রাগিয়ে দেওয়া সবসময় একটি বিখ্যাত কৌশল। প্রতিপক্ষ যদি মেজাজ গরম করে ফেলে, তাহলে তার পরাজয় অত্যাশন্ন। বিশেষ করে আপনি যদি শান্তভাবে মুখে হাসি ধরে রাখতে পারেন।

যারা তাদের প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা রাখে, তাদের বর্ণনায় আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِينَ يَخْتَفُونَ كِبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ﴿٣٧﴾

“...তারা গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কার্যকলাপ থেকে বেঁচে থাকে এবং যখন রাগান্বিত হয়, তখন তারা ক্ষমা করে দেয়।” (সূরাহ আশ-শুরা ৪২:৩৭)

নবিজি (ﷺ) আমাদের সতর্ক করে দিয়ে বলেন, “ক্রোধ হলো মানবহৃদয়ে প্রজ্বলিত অঙ্গারের মতো।” [৪৩]

নবিজি (ﷺ) এর চাচা আবু তালিবের মৃত্যুশয্যার ঘটনায় শেখার আছে অনেককিছু। নবিজি (ﷺ) সে ঘরে প্রবেশ করে আবু জাহেল ও আব্দুল্লাহ বিন আবি উমাইয়্যাহকে দেখতে পান। এরা ছিল কুরাইশ কাফিরদের নেতা। নবিজি (ﷺ) আবু তালিবকে বললেন, “চাচা, ‘লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ সাক্ষ্য দিন, যাতে আল্লাহর কাছে আমি আপনার জন্য সুপারিশ করতে পারি।”

তা শুনে আবু জাহেল আর আব্দুল্লাহ বিন আবি উমাইয়্যাহ তেড়েফুঁড়ে উঠল, “আবু তালিব! তুমি বুঝি আব্দুল মুত্তালিবের ধর্ম ছেড়ে দেবে?” আবু তালিব মারা গেলেন। ইসলামকে সত্য জেনেও লোকলজ্জার ভয়ে তা গ্রহণ না করে চলে গেলেন। তবু নবিজি (ﷺ) বললেন, “আল্লাহ যতক্ষণ নিষেধ না করেন, ততক্ষণ আমি আপনার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করে যাব।”

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا
تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿١١٣﴾

“নবি ও অন্যান্য মুমিনদের জন্য জায়েয নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে, যদিও তারা আত্মীয়ই হোক না কেন, এ কথা প্রকাশ হবার পর যে, তারা জাহান্নামের অধিবাসী।” (সূরাহ আত-তাওবাহ ৯:১১৩)

নবিজি (ﷺ)-এর জন্য এ এক কলিজা-ছেঁড়া মুহূর্ত। তিনি তাঁর চাচাকে ভালোবাসতেন, যিনি নিজেও নবিজিকে ভালোবেসে তাঁর জন্য অনেক কিছু করেছেন। কিন্তু সবচেয়ে গুরুতর বিষয়ে ভুল হয়েছে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান না আনা এবং এক আল্লাহর ইবাদাত না করা। নবিজি তাঁর চাচার কাছে ঈমানের সাক্ষ্যটি ছাড়া আর কিছুই চাননি।

নবিজি ভালো করেই জানতেন যে, মৃত্যুর সময় মানুষ সবচেয়ে স্পর্শকাতর অবস্থায় থাকে। এ সময় চিন্তাশক্তি পরিষ্কার থাকে না। তাই তিনি শান্ত ও স্পষ্ট ভাষায় বললেন, “চাচা, ‘লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ সাক্ষ্য দিন, যাতে আল্লাহর কাছে আমি আপনার জন্য সুপারিশ করতে পারি।”

নবিজি (ﷺ) এর প্রতিপক্ষরা যখন কুরাইশদের ধর্মের কথা মনে করিয়ে দিয়ে আবু তালিবকে ফুসলাতে শুরু করল, তখনও তিনি তাদের সাথে তর্ক জুড়ে দেননি। তিনি কেবল নিজের শান্ত অনুরোধটির পুনরাবৃত্তি করলেন। নবিজির এ আচরণ থেকে আমরা শিখলাম যে, সঠিক হলেই মাথা গরম করার কোনো অধিকার আমরা পেয়ে যাই না। আমরা সত্যের উপর থাকলে বরং আরো শান্ত থাকব। রেগে গেলে চিন্তা ঘোলাটে হয়ে যায় ও কথা আটকে যায়।

বলা হয়ে থাকে, শান্ত স্বভাব হলো উত্তম গুণ। ভেবে দেখুন, শান্ত লোক সব জায়গায় সুবিধা পায়। মতৈক্য হোক বা মতপার্থক্য, গ্রহণ হোক বা প্রত্যাখ্যান। শান্ত স্বভাবের কারণে কারো ভালো গুণ বড় করে চোখে পড়ে আর দোষগুলো ঢাকা পড়ে যায়। এমনকি পাপাচারীও তার ভাবগান্ধীর্যের কারণে পাপাচারের জন্য

দোষারোপ থেকে মুক্ত হয়ে যেতে পারে। নবিজি (ﷺ)-এর কথা আমাদের মনে রাখতে হবে, “কুস্তিতে যে অপরকে ধরাশায়ী করে, সে শক্তিশালী নয়। রাগের মাথায় নিজেকে যে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, সে-ই আসল শক্তিশালী।” (সহিহ আল-বুখারি এবং সহিহ মুসলিম)

নৈতিক চরিত্রের পরীক্ষা

সকল জনপদ ও ধর্মেই নৈতিক সততা ও ন্যায়পরায়ণ আচরণকে অত্যন্ত সম্মান করা হয়। এটি নবিগণের আনীত বার্তার একটি মৌলিক অংশ। শেষ নবি মুহাম্মাদ (ﷺ) তো বলেই দিয়েছেন, “আমাকে সৎ চরিত্রের পূর্ণতা প্রদানের জন্যই প্রেরণ করা হয়েছে।”

এ ব্যাপারে যেহেতু সবাই একমত, সেহেতু বিস্তারিত বলার কিছু নেই। নৈতিক আচরণের বিরুদ্ধে যারা প্রচার-প্রচারণা চালায় ও অশ্লীল আচরণ করে, তারাও নৈতিক চরিত্রের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে।

প্রথা বা অভ্যাসগত কারণেই কিছু পরিস্থিতিতে একজন মানুষ সুন্দর আচরণ করতে পারে। এটাও ভালো জিনিস। প্রখ্যাত সাহাবি আবুদ্বারদা রাঈয়ান্নাহু আনহু সহ আরো কয়েকজনের বর্ণনাসূত্র থেকে জানা যায় নবিজি (ﷺ) বলেছেন,

“জ্ঞান লাভ হয় শেখার মাধ্যমে আর নশ্রতা লাভ হয় নশ্র হওয়ার মাধ্যমে।
যে কেউ কল্যাণ লাভ করতে চায়, তাকেই তা দেওয়া হবে। আর যে-ই
মন্দ থেকে বাঁচতে চায়, তাকে তা থেকে বাঁচানো হবে।” (তারিখ বাগদাদ
এবং তারিখ দিমাশক)

তবে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির আশায় সুন্দর আচরণ দেখানো মোটেই প্রশংসনীয় নয়। সত্যিকারের নৈতিকতা বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে আসে না, ধ্রুব থাকে। এজন্যই পুরনো এক আরবি প্রবাদে আছে, “কারো আসল চরিত্র জানতে চাইলে তার সাথে সফরে বের হও।”

স্বামীর আসল চরিত্র বুঝতে হলে দেখতে হবে দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনে সুখ ও দুঃখ উভয় সময়ে ঘরের ভেতর স্ত্রীর সাথে তাঁর আচরণ কেমন। এখানেই তাঁর নিজেকে সংবরণ করতে হয় এবং ধৈর্যের আসল পরীক্ষা হয়। অহংকার থেকে বেঁচে থাকা, ক্ষমাশীল ও সহনশীল হওয়া, সুন্দর আচরণ দেখানো ইত্যাদি সবই বিবাহিতজীবন ও সংসারজীবনে পরীক্ষিত হয়।

বন্ধুত্বের ব্যাপারেও একই কথা। পরিস্থিতি নির্বিশেষে ব্যক্তির আচরণ ধ্রুব ও নিষ্ঠাপূর্ণ হতে হয়। কত বন্ধুকে যে দুধের মাছি হিসেবে পাওয়া যায়, কিন্তু আসল দরকারের সময় থাকে অদৃশ্য!

বিশ্বস্ত ও নিষ্ঠাবানদের জীবন সুন্দর ও বরকতময় হোক। এরা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নিজেরা বদলে যায় না এবং বিপদের সময় মুখ ঘুরিয়ে নেয় না। কতই না দুর্লভ এমন মানুষগুলো!

দীর্ঘ পরিচয় ও মেলামেশা থেকে কারো চরিত্রের দৃঢ়তা বা ঠুনকোভাব বোঝা যায়। এটাই নৈতিক চরিত্রের প্রথম পরীক্ষা।

আরেকটি পরীক্ষা আছে। ক্ষমতার পরীক্ষা। দুর্বল অবস্থায় অনেকে ভালো আচরণ দেখাতে পারে। কিন্তু এটা স্বভাবজাত নয়। অন্যরকম আচরণ করে দেখিয়ে দেবার ক্ষমতা নেই বলেই তারা অমন। এ ব্যাপারে প্রাচীন আরব কবি আল-মুতানাবি বলেন,

জুলুম করা তো মানবের স্বভাব

না করলে বুঝবে সুযোগের অভাব।

আল-মুতানাবি হয়তো কথাটি অ্যারিস্টটলের থেকে ধার করে থাকবেন। অ্যারিস্টটল বলেছেন, “অত্যাচার মানবস্বভাবের অংশ। কেবল দুটি কারণেই মানুষ এ থেকে বিরত থাকে। হয় ন্যায়পরায়ণতা, নয়তো প্রতিশোধের ভয়।”

ক্ষমতা হাতে আসলেই ব্যক্তির আসল চরিত্র বেরিয়ে আসে। ক্ষমতা, সম্পদ, প্রতিপত্তি পেয়েও যদি কেউ নৈতিক মূল্যবোধ, অন্যের প্রতি মমতা, নম্রতা ও গালমন্দের জবাবে ক্ষমাশীলতা ধরে রাখতে পারে, তাহলেই সে সত্যিকারের মহান ও ভালো মানুষ।

কিন্তু হায়! আকস্মিক ক্ষমতা, খ্যাতি আর সম্পদ পেয়ে মাথা ঠিক রাখা মানুষের সংখ্যা বড়ই নগণ্য।

তৃতীয় পরীক্ষা হলো মতপার্থক্য। সমমনা মানুষদের সাথে প্রায় সবাইই ভালো আচরণ করে। কিন্তু আদর্শিক বা জাগতিক মতভেদ তৈরি হলে মানুষের আসল চেহারা বের হয়।

সম্মানার্থ ও সচ্চরিত্রবান একজন মানুষ সুবিবেচকের মতো ও স্পষ্ট ভাষায় নিজের মত তুলে ধরবে। আর ভিন্নমতের প্রতি অপমান ও অপবাদসূচক ভাষা ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবে। নৈতিক চরিত্র যেকোনো ধরনের নীচ আচরণকে প্রতিরোধ

করবে। যুক্তির বিচারে না পেরে আবেগে বিস্ফারিত হয়ে যাওয়া থেকে বিরত রাখবে।

এর বিপরীত স্বভাবের মানুষ একই পরিস্থিতিতে অন্য সবার প্রতি গালমন্দ ও নালিশ শুরু করে দেবে। এই অযাচিত আচরণ মুহূর্তেই তার নৈতিকতার প্রাসাদ ধসিয়ে দেবে। কেউ কেউ মিথ্যা ও অস্পষ্ট ভাষার আশ্রয় নিয়ে প্রতিপক্ষকে প্রসঙ্গের বাইরে এনে ধরাশায়ী করতে চাইবে।

মতানৈক্যও সম্পর্কে ফাটল ধরাবে না, এ দাবি করা তো ভালো। কিন্তু আসল পরিস্থিতিতে মানুষ কী করে, সেটাই দেখার বিষয়। কিছু ধার্মিক তরুণকে দেখেছি নিজেদের মাঝে মতপার্থক্য হলে তারা এমনসব ভয়াবহ ভাষা ব্যবহার করে, যা শুনে হৃদয়টা ফেটে যায় আর চোখে পানি চলে আসে। পরস্পরকে নির্বোধ বলে ডাকে, অপমান করে, ধোঁকা, বিদ'আত, অনৈতিকতা ও কুফরের অভিযোগ করে। আমি নিজেকে জিজ্ঞেস করি: এইসব নোংরা ঝগড়ার শেষ কোথায়? আল্লাহর মনোনীত ও অনুগ্রহপ্রাপ্ত একটি উম্মাহর বৈশিষ্ট্য হবে এদের মাঝে আসবে? নিজেদের মাঝে ও শত্রুদের সাথে আচরণের ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষা হবে তাদের মাঝে আসবে?

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ اَلَّا تَعْدِلُوْا ۚ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰی

“এবং কোনো সম্প্রদায়ের শত্রুতার কারণে কখনও ন্যায়বিচার পরিত্যাগ করো না। ন্যায়বিচার করো। এটি তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী।” (সূরাহ আল-মায়িদাহ ৫:৮)

কখন আমরা বুঝব যে, ব্যক্তিগত আবেগ ও ক্রোধের বশে করা অনেক আচরণকে আমরা ধার্মিকতা ভেবে ভুল করি?

শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান বলে পরিচিত কিছু লেখককে দেখি। অথচ দ্বিচারিতা ও নির্লজ্জতায় তাঁরা এদের চেয়ে খারাপ না হলেও একইরকম।

মানুষের মনে আক্রমণাত্মক মনোভাব সুপ্ত থাকে। বের হয়ে আসার অপেক্ষা করে। আদর্শ বা রাজনীতিতে সামান্য মতভেদ আসামাত্রই সভ্যতার বাহ্যিক আবরণ ছুঁড়ে ফেলে হিংস্রভাবে একে অপরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

মতভেদের সময়েও সহমর্মী আচরণ ধরে রাখতে শিখব কবে? কবে কান্ডাক্ত শালীনতা বজায় রাখতে শিখব? কখন আমাদের মূল্যবোধ আর নৈতিকতাগুলো তত্ত্ব থেকে জীবনে অনূদিত হবে? টিকে থাকবে আমাদের জীবন ও সম্পর্কের

পুরোটা সময় ধরে? ক্ষমতাধর প্রশাসক, মিডিয়ার মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু, সামাজিক প্রভাবশালী বা সফল ব্যবসায়ী হওয়ার পরও এই আচরণগুলো টিকিয়ে রাখতে হবে। মতভেদের সময়েও এই আচরণগুলো বজায় রাখতে হবে। নাহলে তো কাউকে ভুল করতে দেখলে বা কারো সাথে মতভেদ হলে আমাদের সামনে কেবল দুটিই বিকল্প থাকবে। সম্পর্ক শেষ করে ফেলা অথবা চুপ করে সহ্য করা।

যদিও আমি লিখছি, কিন্তু আমার কলম ধীরে ধীরে বিধাবিহীন। কলম যেন আমারই দিকে ফিরে বলছে, “তুমি নিজে কি এসব মানো?” জবাব দিতে হয়, “না, কিন্তু আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব বলে কথা দিচ্ছি, যতবারই হোঁচট খাই না কেন...”

রাগের সময় আত্মসংবরণ

আমাদের সবাইকেই রাগ সামাল দিতে হয়। এ এমন এক অনুভূতি, যা সময়ে সময়ে জ্বলে উঠে আমাদের শক্তি পরীক্ষা করে। আমাদের সাথে যে অসদাচরণ করেছে, আমরাও তার পর্যায়ে নেমে যাই কি না— তার পরীক্ষা নেয়। কিছু মানুষ আসলেই রাগের সময় নিজেকে সামলে নিতে পারে। এর জন্য বেশ কিছু গুণ থাকা লাগে। এর মধ্যে আমি নয়টি গুণ নিয়ে এখানে কথা বলব।

১। ভুল করা ব্যক্তির প্রতি দয়া, সহানুভূতি ও শিথিলতা

রাসূল (ﷺ)-কে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ বলেন,

بِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۚ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

“আল্লাহর রহমতেই আপনি তাদের জন্য কোমল হৃদয় হয়েছেন। পক্ষান্তরে আপনি যদি রাগী ও কঠিনহৃদয় হতেন, তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। কাজেই আপনি তাদের ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য মাগফেরাত কামনা করুন এবং কাজে কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন।” (সূরাহ আলে ইমরান ৩:১৫৯)

এই আয়াতে খুবই উপকারী একটি শিক্ষা রয়েছে। মানুষকে কোমলতা ও সহজতার মাধ্যমে কাছে টানা যায়। কঠোরতা ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে নয়। আল্লাহ বলেন, “...আপনি যদি রাগী ও কঠিনহৃদয় হতেন, তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত।”

এই আয়াতে যে মানুষদের কথা বলা হচ্ছে, তাঁরা হলেন নবিজি (ﷺ)-এর সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুম। ঈমান বাঁচাতে নিজের ভিটেমাটি ছেড়ে হিজরত করা এবং সেই মুহাজিরদের সাদরে বরণ করে নেয়া মানুষ। মুমিনদের মাঝে এঁদেরকে বলা হয়েছে “সবচেয়ে অগ্রবর্তী” (সূরাহ আত-তাওবাহর ১০০ তম আয়াত দ্রষ্টব্য)। তাঁদের পরে আসা মানুষদের কাছে তাঁদের চেয়ে বেশি কিছু কী করে আশা করা

যায়? আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর চেয়ে অনেক নিচের সারিতে অবস্থান করা আলিম, ইসলামি কর্মী ও নেতাদের কাছে কতটুকুই বা আশা করা যায়?

তাই দয়া ও ক্ষমাশীলতা ছাড়া অন্যকিছুকে ভিত্তি ধরে ঐক্যবদ্ধ হওয়া অসম্ভব।

আবুদদারদা রাঈয়াল্লাহু আনহুকে অপমান করা এক লোককে তিনি জবাব দিয়েছিলেন,

“আমাদের গালমন্দ করো না। সমঝোতার কিছুটা সুযোগ রাখো। আমাদের ব্যাপারে যারা আল্লাহকে অমান্য করে, তাদের প্রতি আমরা একই ভাষায় উত্তর দিই না। বরং তাদের ব্যাপারে আমরা আল্লাহকে মান্য করি।”

ইমাম আশ-শা'ফিকে এক লোক অপমান করায় তিনি উত্তর দেন,

“তুমি যেমনটা বললে, আমি সত্যিই এমন হয়ে থাকলে আল্লাহ আমাকে মাফ করুন। আর আমি সেরকম না হয়ে থাকলে আল্লাহ তোমাকে মাফ করুন।”

খলিফা মুয়াবিয়া রাঈয়াল্লাহু আনহু কে এক ব্যক্তি একদম সরাসরি খুব কটু ভাষায় অপমান করল। তিনি সেই ব্যক্তির জন্য দু'আ করলেন ও তাকে কিছু অর্থসাহায্যও করলেন। এভাবেই তিনি সেই ব্যক্তির কটু কথার জবাব দিলেন।

আমরা যেন আরো বেশি গ্রহণশীল, ধৈর্যশীল ও সহনশীল হই। নম্রতা অনুশীলন করতে করতেই চরিত্রে নম্রতা আসে।

নবিজি (ﷺ) থেকে আবুদদারদা রাঈয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, “জ্ঞান লাভ হয় শেখার মাধ্যমে আর নম্রতা লাভ হয় নম্র হওয়ার মাধ্যমে। যে কেউ কল্যাণ লাভ করতে চায়, তাকেই তা দেওয়া হবে। আর যে-ই মন্দ থেকে বাঁচতে চায়, তাকে তা থেকে বাঁচানো হবে।”

নিজেদের ভেতরটার দিকে তাকাতে হবে। অন্যের সাথে আচরণ করার আগে নিজেদের ঠিক করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, ইসলামি সম্ভাষণ হলো “আপনার উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক।” নবিজি (ﷺ) আমাদের আদেশ করেছেন ঘরে প্রবেশের সময় এই সম্ভাষণ প্রদান করতে। আল্লাহ বলেন,

“ঘরে প্রবেশের সময় নিজেদেরকে সালাম প্রদান করবো।” (সূরাহ আন-

নূর ২৪:৬১)

শিশু-বৃদ্ধ, পরিচিত-অপরিচিত সকলকেই আমরা এই সম্ভাষণ দিই।
নবিজি (ﷺ)-কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল,

أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ

“কোন ইসলাম উত্তম?”

নবি (ﷺ) বললেন,

تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ

“অভাবীকে আহার দান করা এবং পরিচিত-অপরিচিত সকলকে সালাম
প্রদান করা।” [৪৪]

আম্মার রাহিয়াল্লাহু আনহু বলেন, “কেউ যদি তিনটি জিনিস অর্জন করে, তাহলে
ইমানের স্বাদ বুঝতে পারবে। নিজের প্রতি ন্যায়বিচার করা, সকলকে সালাম
দেওয়া, অভাবের সময়েও দান করা।” (সহিহ আল-বুখারি)

এই শান্তির সম্ভাষণের অনেক অর্থ রয়েছে। একটি অর্থ হলো যাকে সালাম দেওয়া
হয়েছে, সে আপনার কথা, চিন্তা ও কাজের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত বা অত্যাচারিত হবে
না।

এই সম্ভাষণ শান্তি, নিরাপত্তা, দয়া ও অনুগ্রহের দু’আ। বহুল ব্যবহৃত এই
কথাগুলোর অর্থ বুঝে এগুলোকে জীবনযাপন ও আচার-আচরণের পদ্ধতি বানিয়ে
নিতে হবে।

২। মহানুভবতা ও সর্বোচ্চ সুধারণা

প্রতিপক্ষের উপর প্রতিশোধ নেবার ক্ষমতা থাকলেও ক্ষমা ও সহনশীলতার
মাধ্যমে জবাব দেওয়া যায়। এটি সত্যিকারের মহানুভবতা। কথায় আছে, “সর্বোত্তম
গুণ হলো প্রতিশোধের ক্ষমতা থাকলেও মাফ করে দেওয়া এবং দারিদ্র্যের সময়ও
দানশীল হওয়া।” আল্লাহ বলেন,

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ الْأُمُورِ ﴿٤٣﴾

“আর যে কেউ ধৈর্য ধরে ও ক্ষমা করে, নিঃসন্দেহে তা দৃঢ়চিত্তের পরিচায়ক।” (সূরাহ আশ-শুরা ৪২:৪৩)

মক্কাবিজয়ের দিন কুরাইশ জমায়েতের উদ্দেশে নবি (ﷺ) বলেন, “তোমাদের সাথে আমি কী করব বলে মনে করো?”

তারা বলল, “উত্তম আচরণ। আপনি একজন সম্মানিত ভাই এবং একজন সম্মানিত ভাইয়ের ছেলো।”

তিনি বললেন, “যাও, তোমরা মুক্ত।”

ইউসুফ আলাইহিসসালামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী ভাইয়েরা অবশেষে তাঁর কজায় এলে তিনি তাদের বলেন,

قَالَ لَا تَثْرِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٩٢﴾

“আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন, এবং তিনি দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু।” (সূরাহ ইউসুফ ১২:৯২)

৩। মহৎ মানসিকতা

কিছু অপমানের জবাব দেওয়া মানে নিজেকে আরো ছোট করা। অপমান সহ্য করে হাসিখুশি থাকার অভ্যাস করতে হবে। ধীরে হলেও নিয়মিত আত্মসংবরণের অনুশীলন করে যেতে হবে।

৪। শুধুই আল্লাহর কাছে প্রতিদান চাওয়া

রাগ একটি তিক্ত জিনিস। মাঝেমাঝে আল্লাহর রহমত ও পুরস্কারের আশায় কষ্ট করে হলেও তা গিলে ফেলতে হয়।

আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন,

مَنْ كَظَمَ غَيْظًا - وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ - دَعَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُخْرِجَهُ اللَّهُ مِنَ الْحُورِ مَا شَاءَ

“রাগ প্রকাশের ক্ষমতা থাকার পরও যে আত্মসংবরণ করবে, কিয়ামতের দিন সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাকে সবার মাঝে থেকে ডেকে নিয়ে নিজের ইচ্ছামতো পবিত্র সঙ্গী বেছে নেবার অধিকার দেবেন।”^[৪৫]

এসব জিনিস নিয়ে কথা বলা সহজ। এতে কোনো পরিশ্রমও লাগে না। আমার মনে হয় রাগের সময় আত্মসংবরণ করা নিয়ে যে কেউই সুন্দর বক্তৃতা দিতে পারবে। কিন্তু আসল সময়ে তা বাস্তবায়ন করা সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। ওই সময়টার জন্য আমাদের যেন আগে থেকেই ধৈর্য, মহানুভবতা, ক্ষমাশীলতার চর্চা থাকে। নাহলে কথা ও কাজের পার্থক্য দেখে আমরা আচমকা স্তম্ভিত হয়ে যাব।

৫। লজ্জাশীলতা

যে আমাদের উপর অন্যায় করছে, আমরাও তার মতো একই পর্যায়ে নেমে যেতে পারি না, এটা করার আগে আমাদের লজ্জিত হওয়া উচিত। জ্ঞানী লোকেরা বলেছেন, “নির্বোধকে সহ্য করা তার স্বভাব গ্রহণ করার চেয়ে ভালো। কারো অজ্ঞতা অনুকরণ করার চেয়ে উপেক্ষা করা ভালো।”

তাইফ থেকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে নোংরা আচরণের মাধ্যমে তাড়িয়ে দেবার ঘটনাটি দেখুন। আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা সেসময়ের কাহিনী বর্ণনা করেন। তিনি একবার তাঁকে (ﷺ) জিজ্ঞেস করলেন, “উহুদের যুদ্ধের চেয়েও খারাপ কোনো দিন কি আপনার গেছে?” নবিজি (ﷺ) বললেন,

তোমার গোত্র আমাকে বড় যন্ত্রণা দিয়েছে। আর এর মাঝেও সবচেয়ে কষ্টকর দিন ছিল আকাবাহর দিন। সেদিন আমি ইবনু আব্দু ইয়ালাইল বিন আব্দু কুলালের সামনে উপস্থিত হই। তিনি আমার অনুরোধ রাখলেন না। আমি মনে খুব কষ্ট নিয়ে ক্লান্তিহীনভাবে সামনে এগিয়ে চললাম। একসময় কারনুস সালিবে উপস্থিত হয়ে আকাশের দিকে চেয়ে দেখলাম একটি মেঘখণ্ড এগিয়ে আসছে। আমি এর মাঝে জিবরিলকে দেখলাম।

তিনি আমাকে ডেকে বললেন, “আপনার জাতির লোকেরা আপনাকে যা যা বলেছে ও বিতর্ক করেছে, তা আল্লাহ শুনেছেন। আল্লাহ আমার সাথে পাহাড়ের ফেরেশতাকে পাঠিয়েছেন। আপনার যা করার ইচ্ছা হয়, তাকে তা আদেশ করুন।”

পাহাড়ের ফেরেশতা আমাকে ডেকে সালাম দিয়ে বললেন, “হে মুহাম্মাদ! যা চান, আদেশ করুন। আপনি চাইলে আমি তাদের দু পাহাড়ের মাঝে পিষে ফেলব।”

[৪৫] সুনান আত-তিরমিযি এবং সুনান আবু দাউদ

আমি বললাম, “না। আমি আশা করি আল্লাহ এদের বংশধরদের থেকে এমন মানুষ বের করবেন, যারা এক আল্লাহর ইবাদাত করবে। তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না।” (সহিহ আল-বুখারি এবং সহিহ মুসলিম)

৬। দয়া ও মহানুভবতা ঈমানের অঙ্গ

আমাদের অন্তর প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের মধ্য দিয়ে যেতে সক্ষম। তাই আমাদের উচিত একে নিয়মিত মহানুভবতার অনুশীলন করানো। আমাদের শিখতে হবে কীভাবে নিজের অধিকার খুশিমনে ছেড়ে দিতে হয় এবং প্রত্যেকবার নিজের পাওনা দাবি করা পরিহার করতে হয়। হৃদয়কে মমতার চর্চা করাতে হবে।

হৃদয়ে যদি অন্যদের প্রতি ভালোবাসার আবাদ করতে পারেন, তাহলে তা কখনও তাদের দ্বারা কষ্ট পাবে না। প্রতিবার নতুন অতিথি এলে তা প্রশস্ত হয়ে জায়গা করে দেবে। প্রতিটি যোগ্য ব্যক্তিকে সে টেনে নেবে।

প্রতিরাতে ঘুমোতে যাবার আগে অন্তরকে মহানুভবতা ও সহনশীলতা শিক্ষা দিন। দেখবেন ঘুম শান্তির হবে। যে কেউ যেভাবেই আপনার প্রতি অন্যায় করে থাকুক, তাদের মাফ করে আল্লাহর কাছে তাদের সংশোধনের দু'আ করুন। এতে আপনিই সবচেয়ে বেশি লাভবান হবেন।

মানুষ তাকাতে বলে প্রতিদিন যেমন কয়কবার আমরা মুখ ধুই, তেমনি অন্তরকেও পরিষ্কার করতে হবে। কারণ আল্লাহ আমাদের অন্তর দেখেন। নবিজি (ﷺ) বলেছেন, “আল্লাহ তোমাদের বাহ্যিক রূপ বা সম্পদ দেখেন না। তিনি তোমাদের অন্তর ও কাজ দেখেন।”

আল্লাহ যেহেতু আমাদের অন্তর দেখেন, তাই এর ব্যাপারে আরো সচেতন হতে হবে। মহত্তম চিন্তা ও সুন্দরতম সংকল্প থাকতে হবে। প্রতিদিন অন্তর থেকে হিংসা, ঘৃণা, কুচিন্তার আবর্জনা পরিষ্কার করতে হবে। জীবনে ইতিবাচক অগ্রগতির পথে এসব আবর্জনা বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

৭। মুখের উপর লাগাম

অন্য কেউ অপমান করতে শুরু করলে নিজেকে সামলানো বড় মুশকিল। এর জন্য কঠিন প্রত্যয় দরকার। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় পাল্টা জবাব দেওয়ার পেছনে শক্তি ব্যয় করার চেয়ে নীরবতার পেছনে শক্তি ব্যয় করলে লাভ বেশি।

নীরবতার মাধ্যমে জবান ও অন্তরের হেফাজত হয়, মূল্যবান সময় বাঁচে। তাই তো আল্লাহ মারইয়াম আলাইহাসসালামকে বলতে বলেন,

إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ﴿٢٦﴾

“আমি পরম করুণাময়ের জন্য চুপ থাকার মানত করেছি। অতএব আজ আমি কোনো মানুষের সাথে কিছুতেই কথা বলব না।” (সূরাহ মারইয়াম ১৯:২৬)

পাল্টাপাল্টি তর্ক ও ঝগড়ায় অন্তর আহত হয়, লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশি হয়।

৮। পরিণতির ভাবনা

সার্বিক কল্যাণের জন্য কোনটি বেশি জরুরি, তা নিরীক্ষা করে বুঝে নেয়া দরকার। এজন্যই পৌত্র হাসান ইবনু আলির প্রশংসায় নবিজি (ﷺ) বলেন, “আমার এই নাতি এক নেতা। হয়তো বিবাদমান দুটি মুসলিম পক্ষের মাঝে আল্লাহ তার হাত দিয়ে মীমাংসা করাবেন।” (সহিহ আল-বুখারি)

এ থেকে বোঝা যায় যে, সকলের জন্য কল্যাণকর বিষয়ে খেয়াল রাখা মহত্বের লক্ষণ। যেমন- ঐক্য রক্ষা, যুদ্ধ বন্ধ করা।

৯। অতীতের ভালো কাজ স্মরণ ও স্বীকার করা

নবিজি (ﷺ) বলেন, “অপরের গুণ স্বীকার করা ঈমানের অঙ্গ।”

ইমাম আশ-শাফিঈ বলেন, “মহৎ মানুষের প্রতি এক মুহূর্তের জন্য মহানুভবতা দেখালেও তিনি তার সম্মান করেন। এক মুহূর্তের জন্যও উপকার করা প্রতিটি মানুষের সাথে তিনি সুসম্পর্ক বজায় রাখেন।”

আমি তো ছিলাম ভালো...

আল্লাহ বলেন,

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

“আর যদি তোমরা তাদের উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদের আশঙ্কা করো, তাহলে স্বামীর পরিবার থেকে একজন বিচারক এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন বিচারক পাঠাও। যদি তারা মীমাংসা চায়, তাহলে আল্লাহ উভয়ের মধ্যে মিল করে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, সম্যক অবগত।” (সূরাহ আন-নিসা ৪:৩৫)

যারা সত্যিকার অর্থেই সম্প্রীতি চায়, আল্লাহ তাদের সাফল্য দানে ধন্য করার ওয়াদা করেছেন। এটা শুধু স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রেই না; পিতামাতা-সন্তান, ভাই-বোন, ব্যবসায়িক অংশীদার, সহকর্মী, প্রতিবেশী— সবার ক্ষেত্রেই সত্য।

এই সম্প্রীতির পথে সবচেয়ে বড় বাধা হলো নিজের মতকে সবসময় ঠিক এবং নিজেকে সবসময় নির্দোষ ভেবে গোঁ ধরে থাকা। উভয় পক্ষই নিজেকে অপরপক্ষের নির্যাতনের শিকার বলে মনে করে।

সম্প্রীতির পথে এই বাধাকে যদি এক শব্দে বলি তবে সেটা হলো ‘অহমিকা’।

এমনকি নিজের আত্মীয়দের মাঝে দ্বন্দ্বও আমি এই বিষয় একাধিকবার দেখেছি। একবার তো একপক্ষ পাঁচ বছর আগ থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত কত খুঁটিনাটি বঞ্চনার শিকার হয়েছে, তার ফিরিস্তি দেওয়া শুরু করল। অপরপক্ষ বেশ কিছুক্ষণ ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে চুপ করে শুনছিল। পরে একসময় তাও অসহ্য হয়ে ওঠে।

অপরপক্ষ যখন বলতে শুরু করল, আবার দেখি ঘুরেফিরে একই ব্যাপার। দীর্ঘ ফিরিস্তি, দীর্ঘ ধৈর্য। এই ধৈর্যটুকু কি এরা এতদিন একজন আরেকজনের সাথে দেখাতে পারল না?

দুঃখের বিষয় এই যে, উভয়পক্ষের কথা শুনলেই মনে হবে তার কথাই ঠিক। কথাগুলো এত আবেগ আর হৃদয় দিয়ে বলা হয় আর মুখের ভঙ্গিমাও এমন হয় যে, এভাবে মিথ্যে বলা সম্ভব না। উভয় পক্ষের কাছেই নাকি শত্রু স্বাক্ষরী আছে।

স্বামী-স্ত্রী নিজেরা তাদের বিরোধের কথা বলার সময় মনে হয় যেন সত্যের পাল্লায় একটি আঙুল রেখে তা নিজের দিকে ঝুলিয়ে রাখে। মাঝেমাঝে একটু দোষ স্বীকার করার মতো দয়াও হয় কারো কারো, “হ্যাঁ, এটা সত্যি যে আমি এমন অমন করেছি...কিন্তু যত যা-ই হোক...” দিনশেষে উভয়ের উপসংহার হবে, “আমি তো ভালোই ছিলাম, উনিই না যত ঝামেলাটা লাগালেন।” সবসময় অপরপক্ষটাই জানে না কীভাবে আচরণ করতে হয়, কীভাবে সঙ্গীর ভালো স্বভাবের মান রাখতে হয়।

এ থেকেই বোঝা যায় অহমিকার মূল কত গভীরে আর মানুষ তা স্বীকার করতে কতটা অনিচ্ছুক। ভাইরাসের মতো ছোট আর দ্রুত যে, ধরাও যায় না। কিন্তু ঠিকই সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়বে। মানুষের সিদ্ধান্ত, কাজ, দৃষ্টিভঙ্গি সবকিছুতে সবার অলক্ষ্যে প্রভাব ফেলে যায়।

আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সময় শয়তানও এই অহমিকাই দেখিয়েছে। আল্লাহ যখন আদমের সামনে সিজদাহ করতে বললেন, ইবলিস বলেছিল,

﴿٧٦﴾ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ

“আমি তার চেয়ে উত্তম। আপনি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন। আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে।” (সূরাহ সাদ ৩৮:৭৬)

মূসা আলাইহিসসালামের দাওয়াত প্রত্যাখ্যানের জন্য ফিরআউনের অজুহাতও ছিল অহমিকা।

﴿٥٢﴾ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ

“হীন এবং স্পষ্ট কথা বলতে অক্ষম এই লোকের চেয়ে আমি কি শ্রেষ্ঠ নই?” (সূরাহ আয-যুখরুফ ৪৩:৫২)

কারুনের অবাধ্যতার অজুহাতও একই অহমিকা। আল্লাহ বলেন,

﴿٧٨﴾ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ۖ أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ

﴿٧٨﴾ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا ۖ وَلَا يُسْأَلُ عَنِ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ

“সে বলল, ‘আমি তো আমার নিজের জ্ঞানবলে এসব পেয়েছি।’ সে কি জানে না যে, আল্লাহ তার পূর্বে তার চেয়েও বেশি ক্ষমতাবান ও সম্পদশালী অনেক প্রজন্মকে ধ্বংস করেছেন? কিন্তু অপরাধীদের তাদের অপরাধের জন্য তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করা হয় না।” (সূরাহ আল-কাসাস ২৮:৭৮)

অহমিকা কারো অজান্তেই তার মাঝে চলে আসতে পারে। এর বিপদ থেকে বাঁচতে সতর্ক থাকতে হয়। এজন্যই কোনো বক্তব্য দেওয়ার আগে নবিজি (ﷺ) এই দু’আ পড়তেন,

وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا

“আর আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই নিজেদের ক্ষতি ও আমাদের কাজকর্মের ক্ষতি থেকে।” [৪৬]

প্রতিপালককে তিনি এই দু’আ করেও ডাকতেন,

اللَّهُمَّ أَهْمْنِي رُشْدِي وَأَعِزَّنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي

“হে আল্লাহ! আমাকে সঠিক পথ দেখান এবং আমাকে নিজের ক্ষতি থেকে রক্ষা করুন।” [৪৭]

আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾

“যাদেরকে আত্মার সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে, তারাই সফলকাম।” (সূরাহ আল-হাশর ৫৯:৯)

আশপাশের মানুষগুলোর আচরণ ও মতামত নিরীক্ষা করলে দেখবেন যে, অনেকের আচরণই তাদের অহমিকা দিয়ে নিয়ন্ত্রিত। যারা নিজেদের নিরপেক্ষ ও বুঝদার দাবি করে, তারাও আলাদা কিছু নয়। দ্বীনদারদের ক্ষেত্রেও এটা সত্য। কেউই এ থেকে মুক্ত না। নফসের ধোঁকা বড় সূক্ষ্ম, বৈচিত্র্যময় ও অধরা। আমরা কখনওই এই অহংবোধ থেকে পুরোপুরি মুক্ত হতে পারব না। কিন্তু এর দ্বারা যেসব ক্ষতি হয়, সেগুলোর ব্যাপারে আগে থেকে সতর্ক তো থাকতে পারব। সত্যি বলতে

[৪৬] সুনান তিরমিযি : ১১০৫

[৪৭] সুনান তিরমিযি : ৩৪৮৩

অহংকার থেকে পুরোপুরি মুক্ত হওয়াটাই অস্বাভাবিক। আর এই অহংকারের কিছু ইতিবাচক প্রভাবও আছে। ইবরাহিম আলাইহিসসালাম দু'আ করেছিলেন,

وَاجْعَلْ لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ﴿٨٤﴾

“এবং আমাকে পরবর্তী প্রজন্মগুলোর মাঝে সুখ্যাতি দান করুন।” (সূরাহ আশ-শু'আরা ২৬:৮৪)

এক ব্যক্তি ভালো কাজ করার পর লোকে তার প্রশংসা করে। এমন ব্যক্তি সম্পর্কে নবিজি (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জবাব দেন,

تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ

“এটা তো দুনিয়াতে মুমিনের জন্য সুসংবাদ।”[৪৮]

তিনি আরো বলেন,

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“মানুষ মারা গেলে তিনটি ছাড়া তার বাকি সব আমলের পথ বন্ধ হয়ে যায়। সদকায়ে জারিয়া, উপকারী জ্ঞান এবং তার জন্য দু'আ করা নেক সন্তান।”[৪৯]

আমাদের অহংবোধ আমাদের অন্যসব স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যের মতোই। মানবস্বত্ত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিন্তু একে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়। কেউ পারে, কেউ একটু কম পারে। এটা যৌনক্ষুধার মতোই। বংশবিস্তারের জন্য এটি জরুরি, কিন্তু একে নিয়ন্ত্রণে না রাখলে তুলকালাম অবিচার ছড়িয়ে পড়ে। আমরা নিজেদের ব্যাপারে ভালো করে জানলে টের পাব কখন আমরা অহংয়ের দাস হয়ে যাই। এই জায়গাগুলো সনাক্ত করতে পারলে নিজেরাও যেমন সুখী থাকতে পারব, অন্যদের সাথেও সঠিক আচরণ করতে পারব। নিজের অহংকার মাপার একটি পদ্ধতি হলো নিজের কথার দিকে খেয়াল করা। এক দিনে আপনি কয়বার ‘আমি’ শব্দটি ব্যবহার করেন? মানুষের মুখে সবচেয়ে বেশি উচ্চারিত শব্দগুলোর মাঝে এটি একটি। আপনার ক্ষেত্রেও এমনটি হয়ে থাকলে, এখনই সময় পরিবর্তনের।

[৪৮] সহিহ মুসলিম: ২৬৪২

[৪৯] সহিহ মুসলিম: ১৬৩১

চলুন, সম্প্রীতি গড়ি

‘সমঝোতা’র চেয়ে ‘সম্প্রীতি’র আলোচনা করাই আমার পছন্দের। আমি মতভেদ দূর করতে বা প্রশমিত করতে চাই না। দ্বীনি ও দুনিয়াবি উভয় ক্ষেত্রেই এমন কিছু বিষয় আছে, যাতে মতভেদ কখনওই এড়ানো যাবে না। এসব মতভেদ বরণ দরকারি ও উপকারী।

কিছু ব্যাপারে পার্থক্য না থাকলে তো মানুষ অনেক উপকারী বিকল্প থেকেই বঞ্চিত হয়ে যেত। এটা আল্লাহ তাআলার হিকমাহ যে তিনি আমাদেরকে নানা ভাষা, নানা রঙ সহ অনেক রকম বৈচিত্র দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এই বৈচিত্র আমাদের জীবনকে সমৃদ্ধ করে।

সম্প্রীতি মানে আমাদের মতভেদকে দ্বন্দ্ব-সংঘাতে পরিণত হতে না দিয়ে ইতিবাচক উপায়ে ব্যবহার করা। এর অর্থ মানুষের চিন্তাধারা এক করা নয়, বরণ হৃদয়গুলোকে এক করা।

সম্প্রীতির একটি নৈতিক প্রেরণা আছে। এর দৃষ্টিভঙ্গি প্রশস্ত, শুধু জ্ঞান আর সচেতনতা বাড়ানোর মাঝে সীমাবদ্ধ নয়। কিছু তথ্য জানলেই বা অপরপক্ষের মত শুনলেই মানুষের মতামত, আচরণ, আগ্রহ ও দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে যায় না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদের এই পার্থক্য যেন কিছুতেই একে অপরের প্রতি আমাদের অন্তরগুলো কঠিন করে না দেয়।

সম্প্রীতি মানে হলো যেসব বিষয়ে আমরা একমত, সেগুলোতে বেশি মনোযোগ দেওয়া। আর আমাদের সবার প্রয়োজনীয় মানবিক প্রচেষ্টায় পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়ানো। এমন অনেক বিষয়ে অন্যদের সাথে ইতিবাচক লেনদেনের প্রচুর সুযোগ রয়েছে। ধর্মীয় ব্যাপারেও এ কথা খাটে।

এই প্রচেষ্টাগুলো আমাদের সময় ও মনোযোগ পাওয়ার দাবিদার। কুরআন-সুন্নাহ আমাদের এভাবেই আচরণ করতে শেখায়। আমাদের ভালো-খারাপ মানবীয় অভিজ্ঞতার সমষ্টি থেকে বোঝা যায় যে, সদৃষ্টি ও সম্প্রীতির সাথে একে অপরের

সাথে কাজ করাই সর্বোত্তম। সাধারণ নীতি, বিশ্বাস, ও জনকল্যাণের ভিত্তিতে একসাথে কাজ করলে আমরা সবাইই উপকৃত হই।

আমাদের মধ্যকার ছোট বা বড় পার্থক্যগুলো ভুলে যাওয়া ঠিক নয়। তবে এগুলোর ব্যাপারে এত সংবেদনশীল হওয়া যাবে না, যার ফলে সেগুলোই আমাদের চিন্তা ও আবেগের নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠে। আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক এমন শক্তিশালী হতে হবে যেন মতপার্থক্যের ফলে তাতে ভাঙন সৃষ্টি না হয়।

জীবন কোনো যুদ্ধ নয়। সম্প্রীতি অর্থ ভদ্রভাবে দ্বিমত করা, প্রতিশ্রুতি সহকারে একমত হওয়া। এটি একটি জানাশোনা নৈতিক অবস্থান। বুদ্ধিবৃত্তির বৈধ অধিকার আর অহমিকার অবৈধ উচ্চাকাঙ্ক্ষার মাঝে এটিই পার্থক্য গড়ে দেয়।

সম্প্রীতি মানে এক চিরন্তন দ্বন্দ্ব জয়লাভ করা। এই দ্বন্দ্ব আমাদের খেয়াল-খুশি ও লোভ-লালসার বিরুদ্ধে। ভুলে গেলে চলবে না যে, আমাদের স্বার্থান্বেষী চিন্তাগুলো অনেক সময়ই “দ্বীনের প্রতি নিষ্ঠা”র ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়ায়। ফলে তাদের সহজে চেনা যায় না।

আল্লাহ বলেন,

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ ﴿٦﴾ أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ ﴿٧﴾

“মানুষ অবশ্যই সীমালঙ্ঘন করে। কারণ, সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে।” (সূরাহ আল-আলাক ৯৬:৬-৭)

সুমহান আল্লাহ, যিনি মানবমনের সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর জটিলতাগুলো সম্পর্কে জানেন।

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ﴿١٩﴾

“আল্লাহ চক্ষুর অন্যায় কর্ম সম্পর্কেও অবগত; আর অন্তর যা গোপন করে, সে সম্পর্কেও।” (সূরাহ গাফির ৪০:১৯)

হৃদয়ের বিশুদ্ধতা শুরু থেকেই গুরুত্বপূর্ণ। তা যদি আপনার থাকে, তাহলে অন্যের সাথে সম্প্রীতি গড়ার জন্য আপনার চাই প্রতিপালকের সামনে বিনয়ী হওয়া, অন্যের অধিকারের প্রতি সম্মান জানানো, এবং নিজের বিরুদ্ধে হওয়া অন্যায় ক্ষমা করা।

মনে রাখতে হবে যে, কাজের চেয়ে কথা সবসময়ই সহজ। ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সমাজ ও জাতি হিসেবে অগ্রসর হতে হলে তুচ্ছ স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে সকল কাজে সততার জন্য সংগ্রাম করতে হবে।

কুরআনের এই দু'আ ভালো করে খেয়াল করি সবাই:

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا
رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٠﴾

“হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এবং আমাদের পূর্বে ঈমান আনা ভাইদের ক্ষমা করে দিন। আমাদের অন্তরের মাঝে ঈমানদারদের প্রতি কোনো বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয় আপনি পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু।” (সূরাহ আল-হাশর ৫৯:১০)

লেখক পরিচিতি

শাইখ সালমান বিন ফাহদ বিন আবদুল্লাহ আল আওদাহ ১৯৫৫ সালে সৌদি আরবের বুরাইদা শহরের নিকটবর্তী আল-বাসর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মাধ্যমিক শেষ করার পর তিনি রিয়াদের ইমাম মুহাম্মাদ বিন সৌদ বিশ্ববিদ্যালয়ে এরাবিক ল্যাঙ্গুয়েজ ফ্যাকাল্টিতে ভর্তি হন। সেখানে দুই বছর অধ্যয়নের পর তিনি ভর্তি হন শরিয়াহ ফ্যাকাল্টিতে। এখান থেকে ইসলামি শরিয়াহর উপর তিনি B.A, M.A এবং পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেন। এখান থেকে তিনি আবার বুরাইদা ফিরে যান এবং সেখানে একাডেমিক ইনস্টিটিউটে আরও ছয় বছর অধ্যয়ন করেন। সালমান আল আওদাহ শাইখ আব্দুল আযীয ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু বায, শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু উসাইমিন, শাইখ আবদুল্লাহ আব্দুর রহমান জিবরিন সহ আরও অনেক আলিমের অধীনে পড়াশোনা করেছেন। পেশাগত জীবনে তিনি শিক্ষকতা, লেখালেখি এবং দাওয়াতি কাজে নিয়োজিত। ২০১৭ সালে সৌদি আরবে চলমান আলিমদের গ্রেফতার প্রক্রিয়ায় শাইখ সালমান আল আওদাহও গ্রেফতার হন এবং কোনো বিচার ছাড়াই তিনি এখনও সেখানে বন্দী আছেন। আল্লাহ তাঁর কল্যাণকর মুক্তি ত্বরান্বিত করুন। আমীন।

শুধুমাত্র মতের মিল হয়নি বলে যখন কেউ আমাকে গালমন্দ করল, এমন পরিস্থিতিতে নিজের রাগ গিলে ফেলে নিজেকে শান্ত রাখতে পারার সেই স্মৃতি মনে পড়লে ভালোই লাগে। যত যা-ই হোক, আমাদের মাঝে মতপার্থক্যের চেয়ে ঐক্যমত্যের সংখ্যাই বরং অনেক বেশি। ভাবতে ভালোই লাগে যে, আল্লাহ নিজেকে সংবরণ করতে আমাকে সাহায্য করেছেন। মাথা গরম করে অনর্থক ও তুচ্ছ বিতর্কে লিপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন। না হলে আমি হয়তো সচেতন বা অবচেতনভাবে নিজের নফসকে বিজয়ী করার নিয়তে তর্ক শুরু করতাম—সত্যকে বিজয়ী করার জন্য না। এরকম পরিস্থিতিতে স্বার্থ ও কুতর্ককে জায়েয করার জন্য অনেকরকম চটকদার সাইনবোর্ড লাগাতে ইচ্ছে হয়। “সত্য প্রকাশ করা”, “সঠিক বিষয় উন্মোচন” আরো কত কী! নিজেকে এই ঝোঁকের কাছে সাঁপে দেওয়া মানে দুর্গম ও প্রাণহীন এক মরুভূমিতে আছড়ে পড়া।

ধর্মীয় চেতনা অন্তরে লালন করে আমাদের উচিত ছিল আদর্শ ও সদাচারী মানুষ হওয়া—যাদের পারস্পরিক লেনদেন হবে ইতিবাচক। দুর্ভাগ্যবশত অনেকে এর ফলে উল্টো সংকীর্ণমনা, খিটমিটে ও বিদ্বেষী হয়ে ওঠে। কখনও তাদের জযবা তাদের উদ্বুদ্ধ করে সারাক্ষণ অন্যের দোষ খুঁজে বেড়াতে। এই ধরনের মানুষদের সকলে এড়িয়ে চলতে পারলেই বাঁচে। কারণ, এদের কাছে গেলেই নানা প্রশ্নবাণে জর্জরিত হয়ে নিজের ধার্মিকতার ইন্টারভিউ দেওয়া লাগবে: “আপনি কোন মতাদর্শে বিশ্বাসী? কোন কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করেন? আপনার শাইখ কে? অমুক অমুক বিষয়ে আপনার অবস্থান কী?”

এই বইয়ের অধ্যায়গুলো আসলে কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন সময়ে লেখা আমার কিছু প্রবন্ধ। তবে এগুলো পরস্পর নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। প্রতিটিরই আলোচ্য বিষয় হলো মতানৈক্য ও দ্বন্দ্ব এবং এসব ক্ষেত্রে আমাদের করণীয়। এ সংক্রান্ত আলোচনার যেসব দিক আমার বিগত প্রবন্ধগুলোতে ছুটে গিয়েছিল, সেগুলোর উপর আমি নতুন করে লিখেছি।